পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; ভাদ্র, প্রথমপক্ষ। [ত্রয়োদশ সংখ্যা।

৺ জগৎরাম রায়ের রামায়ণ।

ভূমিকা। (১)

বাকুড়া জেলার অন্তঃপাতি মহিষাড়া পরগণার উত্তরপশ্চিমভাগে দামোদর নীরে ভূলুই নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রাম রাণিগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নদীপারে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যে সময় ভাষা-মহাভারতলেখক কাশীরাম দাস সিঙ্গি-গ্রামে বসিয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত লিখিতেছিলেন, প্রায়-ঠিক সেই সময়ে ভূলুইয়ে বসিয়া জগতরাম রায় অদ্ভুত পুরাণানুমত সমগ্র রামায়ণকাব্য ভাষায় লিখিতে ছিলেন। তাঁহার নিজের ও দেশের উভয়েরই সৌভাগ্যক্রমে কাশীরামের শ্রম সফল হইয়াছে;—তাঁহার মহাভারত লোক প্রথিত ও মুদ্রিত হইয়া দেশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। আর জগতরাম রায়ের বৃহৎগ্রন্থ, সমগ্র-রামায়ণ, অদ্যাবধি হস্তলিখিত তুলটের পুঁথির

(১) জগৎরাম কে ও তাঁহার রামায়ণ কোন সময়ে লিখিত, তাহা এই ভূমিকাপাঠে পাঠক জানিতে পারিবেন। আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিজের লিখিত এই ভূমিকাটি ও ৺জগৎরাম রায় বিরচিত রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ড' নামক অংশ, পাক্ষিক সমালোচকের [illegible] আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ভরসা করি, এরূপ আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ভরতসম্বাদ ক্রমশঃ সমালোচকে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এস্থলে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকদিগের নিকট আমাদের একটী নিবেদন। জগদ্রামকৃত রামায়ণ কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। উহার সরলতা, কবিত্বময়তা ও করুণরসের উচ্ছ্বাস প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গৌরবস্বরূপ। দুইশত বৎসর অতীত হইল এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অন্যদেশ হইলে এতদিনে উহার শত শত 'সংস্করণ' প্রকাশিত হইত ও গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তমূলক গ্রন্থে দেশ 'ছাইয়া' যেমিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশ সেরূপ নহে। এদেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের কত অমূল্য রত্ন যত্নাভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? বঙ্গবাসীর অজ্ঞতা ও উদাসীনতাবশতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাপ্রসূত কত উপাদেয় অনুপম সামগ্রী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্যের অজ্ঞাতে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতই ইহা আমাদিগের নিতান্ত অগৌরবের বিষয়ে, [illegible]

এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অংশবিশেষের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার একাংশও আজ পর্য্যন্ত যন্ত্রস্থ হয় নাই, দেশীয় সাহিত্য-বন্ধুগণ তাঁহার নামমাত্রও অবগত নহেন। অপরের কথা দূরে থাকুক, প্রসিদ্ধ "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" গ্রন্থকার মান্যবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও দেশবিদেশে এত যত্ন ও এত অনুসন্ধান করিয়াও তাহার 'নামগন্ধ' জানিতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ জগতরাম রায়ের কল্পনাপ্রসূত এই প্রসূনের সৌরভ বাঁকুড়াপুরুলিয়ার কঙ্করপ্রান্তরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সে অঞ্চলে অদ্যাবধি দেশহিতৈষী এমন কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি বহুল-ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন করিয়া প্রচার করিতে সমর্থ। গ্রন্থকারের

মানুষের আমরা যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাহা সংরক্ষণ করিতে পূর্ব্বেও আমরা সমর্থ হই নাই,—এখনও সম্যকরূপে সমর্থ হইতেছি না। জগদ্রাম রায়ের এই রামায়ণগ্রন্থ—কবিত্বের আধার সত্ত্বেও—সমাজ চিত্রের উজ্জ্বল আলম্বন হইলেও দেশের কয়জন লোক ইহার বিষয় অবগত আছেন? কে এতদিন ইহার নাম শুনিয়াছিলেন? শুনিবেন কিরূপে? দুইশত বৎসরের এই মূল্যবান পুরাতন গ্রন্থ হস্ত লিখিত পুঁথির আকারে অজ্ঞানিত বঙ্গগৃহের নিম্জন ও অন্ধকার কক্ষে অর্গলবদ্ধ থাকিয়া কীটদষ্ট হইতে ছিল,—কখন মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দেখা দূরে থাকুক, বাঁকুড়া জিলার সীমান্তরে গমন করে নাই, 'বনে ফুটে বন ফুল বনে নিপতন' হইয়া ধ্বংশ হইতেছিল। এইরূপে হয়ত বঙ্গের অসংখ্য কবিতাকুসুম 'বনে' প্রস্ফুটিত হইয়া বনেতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; মনুষ্যের কিছুমাত্র উপকারে আইসে নাই। 'অমরত্ব-লাভ করিবার জন্য, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিবার জন্য, মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তি উল্লসিত ও সুবাসিত করিবার জন্য, যে মানসপুষ্পের সৃষ্টি, তাহার অযথা লয়প্রাপ্তি কি অপরিসীম আক্ষেপের বিষয়। আমরা আজ যে গ্রন্থখানির বিষয় অবতারণা করিয়াছি, শিব-দাস বাবুর যত্নব্যতীত হয়ত ইহার নামও কখনও শুনিতে পাইতাম না। এই সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তি বহুদিন হইতে অনুসন্ধান করিয়া, অনেক যত্নে ও অর্থব্যয়দ্বারা জগদ্রামকৃত রামায়ণের অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অবশিষ্টাংশ সংগ্রহকল্পে সমগ্র

গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া জগৎরামের অক্ষয় কীর্ত্তি ও বঙ্গসাহিত্যের একটী অতি উপাদেয় সামগ্রী, রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কার্য্যটী যেমন গুরুতর তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। একপ কার্য্য জন সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে মধ্যবিত্ত অবস্থার জনৈক ভদ্রলোকদ্বারা কদাচিৎ সম্পন্ন হইতে পারে। জগৎরামের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তি। জাতীয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য, বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ কি অগ্রসর হইবেন না? অবশ্যই হইবেন। বাঙ্গালী ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট দ্রব্যের আদর করিতে শিখিতেছেন—কবিত্বের ও সাহিত্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি, বুঝিতেছেন, পরন্তু সে দিন ৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামক প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষ গুণ সমন্বিত না হইলেও (কেবলমাত্র 'বঙ্গবাসীর' বিজ্ঞাপনের খাতিরে), যেরূপ আগ্রহের সহিত বঙ্গীয় পাঠক পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনায়াসেই আশা করিতে পারি যে, স্বভাবকবি জগৎরামের এই অনুপম কাব্যগ্রন্থের প্রতি তাঁহারা তাচ্ছিল্য করিবেন না, ও উহার প্রকাশার্থে শিবদাস-বাবুকে উৎসাহিত করিবেন। বাঙ্গালী পাঠক আজ-কাল অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থের জন্যও অর্থব্যয় করিতে-ছেন, এক্ষণে তাঁহার যৎসামান্য সাহায্যের অভাবে যদি বঙ্গভাষার একখানি উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থের ধ্বংস হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিব, বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক বিদূরিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। এই পত্রে প্রকাশিত 'ভরত-সম্বাদ' হইতে, পাঠক জগৎরামের সহৃদয়তা, লিপি-নৈপুণ্য ও কবির শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতে পারিবেন।

পা, স, সম্পাদক

বংশে অদ্যাপি কেহ জীবিত আছেন কি না সন্দেহ। সেইগ্রামে ও তন্নিকটস্থ গ্রামে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। একবার সমগ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে টাকা দিতে প্রস্তাব করায়, অভদ্র কৃষ্ণবর্ণ কৃষকাকৃতি একজন মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া রায়মহাশয়ের প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয় দিল। কবিবরের বংশাবলীর পরিচয় কি ও তাঁহার হস্তলিখিত রামায়ণ তাহার নিকট আছে কি না, এবম্বিধ কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক কোন উত্তর না পাওয়ায় ও অন্যান্য লোকের মুখে তাহাকে প্রতারক বলিয়া জানিতে পারায়, সে কবির কেহ নয় বলিয়াই স্থির করিয়া লইতে হইল। সে যাহা হউক, যদি কোন স্থানে কাহারও ধমনীতে রায়মহাশয়ের শোণিত প্রবাহিত থাকে, তাঁহার দ্বারা যে এতবড় গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার হইবে এমন আশা দুরাশা।

আমি কার্য্যানুরোধে বাঁকুড়া জেলায় ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যার সময় এক পল্লীতে উপস্থিত হই। যে ভদ্রলোকের গৃহে আমার রাত্রিযাপন করা নির্দ্ধারিত হইল, সেই স্থানে একটু রাত্রি হইলে দেখিতে পাইলাম, গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক আসিয়া সমবেত হইল। কতক্ষণ পরে দুইজন ব্রাহ্মণ (শুনিলাম, তাঁহারা দুই সহোদর) আসনে জড়ান একখান পুঁথি লইয়া উপস্থিত হইলেন ও কিয়ৎ পরে দুইজনে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিলিতস্বরে দীপালোকে সেই পুঁথি তান তুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। যদিও ইংরাজী মেজাজ, তথাচ তাঁহাদের পাঠ ও গ্রন্থের ভাব আমার বেশ মিষ্ট লাগিতে লাগিল। তাঁহাদের সঙ্গীতের বিষয়টী 'ভরত সংবাদ'। শ্রীরাম পিতৃসত্যপালনার্থ বনগমন করিলে ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়া রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে যান ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে অকৃতকার্য্য হন, পরে তাঁহার পাদুকা আনিয়া পিতৃসিংহাসনে স্থাপন করতঃ চৌদ্দবৎসরবধাবৎ তদুপরি ছত্রদণ্ড ধরিয়া রামের নামে রাজ্যপালন করেন। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত। তবে কবি নিজ কল্পনাপ্রভাবে ইহার মধ্যে এত করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন এবং ভাষাও এত মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে যে, সে দিবস অশিক্ষিত কৃষক শ্রোতাদের মধ্যেও অতি অল্প লোক ক্রন্দন সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্মরণ হইতেছে, আমিও কাঁদিয়াছিলাম। সেই ব্রাহ্মণদের নিকট অনেক কষ্টে আমি এই 'ভরত সংবাদ' সংগ্রহ করিলাম। তার পর কবিবরের বাসভূমি ভুলুইয়ে যাই। স্থানটী এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল-রজত-রেখার ন্যায় ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। আমি চৈত্রমাসে গিয়াছিলাম, কিন্তু আর তিন চারিমাস পরে এই দামোদরের যে প্রতাপ তাহা মনে হইলেও ভয় হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগৎরাম রায়ের বংশের কাহাকেও পাই নাই। ভুলুই ও অর্দ্ধগ্রামের অনেক ব্রাহ্মণের উপাধি—রায়। তাঁহাদের কেহই জগৎরাম রায়ের জ্ঞাতিত্বও স্বীকার করিলেন না। কিন্তু অনেকের

মুখেই শুনিলাম ৭৮ পুরুষ পূর্ব্বে তিনি ঐ গ্রামে বাস করিতেন ও তিনিই রামায়ণ রচয়িতা। তাঁহার বাসভূমির স্থান কেহ কেহ নদীগর্ভদিকে দেখাইয়া দিল।

ঐ গ্রামের অনেকের ঘরে এই রামায়ণের কোন না কোন অংশের হাতে লেখা পুথি আছে এবং শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে সে পুথির পূজা হইয়া থাকে। তথাকার সকলেই উক্ত রামায়ণকে অতি আদর করিয়া থাকেন ও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত উহা গীত হইয়া থাকে। কিন্তু পঞ্চকোট রাজ্যমধ্যে সর্ব্বস্থানেই ইহার আদর। দুই এক স্থান কবির ভণিতিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চকোটের গর্গবংশীয় রঘুনাথসিংহ-ভূপের আদেশে ও অনুগ্রহাশয়ে তিনি ঐ কাব্য রচনা করেন।

রামমহাশয়ের পরিচয় তাঁহার নিজ গ্রন্থ মধ্যেই দেওয়া আছে। যথা,—

"পিতা রঘুনাথ রায়, মাতা শোভাবতী,—
দোঁহে জন্মদাতা; (আমি অধম অকৃতি)।
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বারেবার,
জিহ্বাতে রসবে নাম পদে নমস্কার।
যাঁহার আদেশে হৈল গ্রন্থের রচনা,
নিরন্তর তাঁর পদ করিনে বন্দনা।
শ্রীমাধব, রাধাকান্ত, রামকান্ত আর,
শ্রীরামগোবিন্দ,—ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার।"

আমি তাঁহার গ্রন্থের যে কয়েক অংশ পাইয়াছি, তাহার কয়েক স্থানে এরূপ ভণিতিও মিলিয়াছে, যথা—"পিতা জগৎরাম পায়, সঁপিয়া আপন কায়, রামপ্রসাদেতে ইহা গায়।" ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, রামপ্রসাদ রায় নামে জগৎরামের এক পুত্র ছিলেন ও তিনিও কবিতা লিখিতে পারিতেন। গ্রন্থের সর্ব্বশেষে জগৎরামের ভণিতি আছে। ইহাতে বোধ হয় রামপ্রসাদ পিতৃবিয়োগান্তে পিতার আরব্ধ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন নাই, তাঁহার জীবিতকালেই লিখিতেন ও তাঁহার পিতা তাহা গ্রাহ্য করিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে স্থানদান করিতেন।

আমরা জগৎরাম রায়কে কাশীরাম দাসের সমসাময়িক বলিয়াছি, কিন্তু এখনও তাহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করি নাই। তাহার প্রমাণ তাঁহার নিজগ্রন্থমধ্যেই আছে। রাবণবধ করিতে ভগবতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য রামচন্দ্র লঙ্কায় শরৎকালে যে দুর্গাপূজা করেন, আমাদের কবি নিজ কল্পনাপ্রভাবে তাহার যেরূপ সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন, অন্য কোন রামায়ণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তাহার নাম তিনি দুর্গাপঞ্চরাত্রি দিয়াছেন। সেই দুর্গাপঞ্চরাত্রির শেষে নিম্নলিখিত কবিতা আছে। যথা—

"ভুজ-বন্ধু রস চন্দ্র শক পরিমাণ,
মাধব মাসেতে, শুক্লপক্ষ শুভদিনে,
ষোড়শ দিবসে পুথি হৈল গুরুবারে,
সমাপ্ত দশমীপালা হৈল এতদূরে।"

এই শ্লোক হইতে আমরা যথাজ্ঞান আমাদের কবির সময় নিরূপণ করিয়াছি।

ভুজ	২
বন্ধু	০
রস	৬
চন্দ্র	১

"অঙ্কস্য বামাগতি":—ধরিয়া এই অঙ্কপাতে ১৬০২ হইল। অতএব লঙ্কাকাণ্ডের দুর্গাপঞ্চরাত্রি-পালা ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত হয়।

ঐ দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে আমরা এই কবিতাটীও পাইয়াছি। যথা—

"পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ,
যেহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ।
পঞ্চদিন গানমধ্যে শুন বিবরণ,
তিন দিবসের গান করিলা রচন।
নবমী দশমী দুই দিবসের গান,
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান,
অঙ্গীকার নৈল আমি পিতার বচনে,
আগুপাছু কিছুমাত্র না গণিনু মনে।
একে বেদ অবিদিত চরিত্র দুর্গার,
তাহাতে পিতার বাক্য অতি চমৎকার।
বিমল ভানুর তুল্য কাব্যের প্রকাশ,
আমার বর্ণনা কি শোভায় তার পাশ?—
শিশুমতি, মর্ম্ম অতি, জ্ঞান বিবর্জ্জিত,
ছন্দঃ শব্দ আদি কাব্যবিষয়ে রহিত।
বালকে বলয়ে যদি অস্ফুটবচন,
তাহা শুনি পিতামাতা হরষিত মন।
সেহ জন্য মোর কাব্যে নাহি রসলেশ,
পিতারে কি ভাল তেঁই দিলা উপদেশ।"

ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, জগৎরাম সমস্ত রামায়ণ শেষ করিয়া ঐ দুর্গাপঞ্চরাত্রির ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর বিষয় বর্ণনাপূর্ব্বক নিজপুত্র রামপ্রসাদকে নবমী ও দশমীর পালা লিখিতে আদেশ দেন ও সেই আদেশানুসারে রামপ্রসাদ দুর্গাপঞ্চরাত্রি সম্পূর্ণ করেন। যে শকে তাহা সম্পূর্ণ হয় তাহা 'ভুজ-বন্ধ্র'-আদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

জগৎরামের রামায়ণমধ্যেও রামচন্দ্রের দেবীপূজার সংক্ষেপ বর্ণনা আছে। অতএব বোধ হইতেছে, কবি বৃহৎ সমগ্র রামায়ণ শেষ করিয়া এই দুর্গাপঞ্চরাত্রি-খণ্ডকাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। উপরে উদ্ধৃত কবিতায় "যেহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ" তাহাই বলিয়া দিতেছে।

এক্ষণে বিচার করা যাউক, একজন গৃহস্থ হিন্দুধর্ম্মব্রত ব্রাহ্মণ কতদিনে রামায়ণের ন্যায় একখানি বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিয়া উঠিতে পারেন। সে কালে ব্রাহ্মণদের সমস্ত প্রাহ্নকাল, প্রাতঃসন্ধ্যা, পূজার আয়োজন, গৃহস্থশিব কর্ম্মক্রিয়া, পরে স্তবকবচপাঠ ও জপতপপূজা করিতেই অতিবাহিত হইত। লিখিবার ও পড়িবার সময় অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে যাহা কিছু থাকিত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতি দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং 'নিঃশব্দ নিশীথ' সময় পর্য্যন্ত তৈলক্ষয় করিয়া পড়িবার রীতিও, বোধ হয়, ছিল না।

এমন অবস্থায় সংস্কৃত মূলগ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক সমস্ত রামায়ণখানি লিখিতে রায় মহাশয়কে যে প্রৌঢ়কাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, এ প্রকার অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। দুর্গাপঞ্চরাত্রির শেষভাগ সম্পূর্ণ করিতে সন্তানকে আদেশ দেওয়ায় বরঞ্চ সে অনুমান প্রকৃত কথা বলিয়াই বোধ হয়। আরও, সন্তান যে সময়ে এরূপ কবিতা লিখিতে সক্ষম, যাহা কবিবর পিতার অনুমোদিত হইতে পারে, সে সময়ে পিতার বয়স যে প্রবীণ, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। অতএব দুর্গাপঞ্চরাত্রি যে সময় সম্পূর্ণ হয়, সে সময় জগতরাম রায়ের বয়ক্রম, আমরা যদি ৬০।৬৫ অথবা অন্ততঃ ৪০।৪৫ও ধরিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় কেহ আমাদিগকে দোষ দিতে পারেন না। দেখান গিয়াছে যে, দুর্গপঞ্চরাত্রি ১৬০২ শকে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং জগতরাম ১৫৬০ শকে অথবা

তাহার ৫।৭, বৎসর পূর্ব্বে বা পরে যে প্রাদুর্ভূত হন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এখন শকাব্দাঃ ১৮০৬, অতএব তিনি ১৮০৬—১৫৬০=২৪৬ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ২৫০ সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। মান্যবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ১২৬ পৃষ্ঠায় অনুমানে লিখিয়াছেন,—

"এইক্ষণ হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীরাম দাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন"

এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা জগতরাম রায়কে কাশীরাম দাসের সমসাময়িক বলিয়াছি।

কীর্ত্তিবাস কবির নিন্দা করা অথবা তুলনায় জগতরামের গৌরব বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে;। তথাচ কীর্ত্তিবাসের ভরত সংবাদে ও জগতরামের ভরতসংবাদে যে, অনেক তারতম্য আছে, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কীর্ত্তিবাস শত্রুঘ্নকে এক 'কাঠগোঁয়ার' তৈয়ার করিয়া তাঁহার দ্বারা কুব্জী মন্থরার কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছেন। শত্রুঘ্ন

"বুকে হাঁটু দিয়া কুব্জির ধরে গলা
মুদ্গরের বাড়িতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা"।

শত্রুঘ্ন উপযুক্ত শত্রু পাইয়াছিলেনই বটে!! জগতরাম রায় শত্রুঘ্নকে ধীর, বিজ্ঞ, ও সন্তপ্ত ভরতকে সান্ত্বনা ও মন্ত্রনা দিতে সক্ষম করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এইটীই শত্রুঘ্নের পূর্ব্বাপর চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত। কীর্ত্তিবাসের ভরতসংবাদ পড়িয়া কেবল করুণরসের আভাসমাত্র মনে উদয় হয়। জগতরামের এই ভরতসংবাদ পড়ুন, দেখিবেন, ইহা করুণরসে ওতপ্রতভাবে মাখা। ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরতসৈন্যের আতিথ্যে কীর্ত্তিবাস কবি কি অরুচিকর ও অশ্লীলভাব মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। জগতরাম রায়ের ভরতসংবাদ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী মিলিয়া পড়ুন, এমন একটী শব্দও পাইবেন না যাহা পড়িতে কুণ্ঠিত হইতে হইবে।

উপসংহারকালে বক্তব্য, আমরা অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া রায়মহাশয়ের রামায়ণের অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছি। আরও ব্যয় করিতে পারিলে সমগ্র সংগ্রহ করিতে পারিতাম। কিন্তু এত বড় গ্রন্থ (কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা কম নহে, বরঞ্চ বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা) একবারে যন্ত্রস্থ করিতে সাহস হয় না। তজ্জন্যই প্রথমে তাহার এই ক্ষুদ্রাংশ প্রকাশ করিলাম। ইহা যদি সাধারণসমীপে আদরণীয় হয়, তাহা হইলে অন্যান্যাংশ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। বিশেষতঃ 'সুলোচনার পালা' বলিয়া যে আর এক অংশ আমাদের হস্তগত আছে তাহা এই ভরতসংবাদ হইতে বৃহৎ ও মধুরতর; সেইখানি প্রচার করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা রহিল।

মজঃফর্পুর;
৫ই শ্রাবণ,
শকাব্দা ১৮০৬।

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য,
প্রকাশক।

সমালোচনা ও সমালোচক।

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, সমালোচনার মৌলিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিতে, 'সমালোচনা' শব্দ সম্যক সাধারণ ও প্রশস্ত ভাবার্থে ব্যবহার করিয়াছি। 'সমালোচনা'শব্দ সচরাচর যে বিশেষ ভাবার্থে ব্যবহৃত হয় তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র বা বিশেষ ভাবার্থে একজন গ্রন্থকারকে অর্থাৎ যিনি কোন মূলতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গ্রন্থ লিখেন, তাহাকে 'সমালোচক' বলা যায় না। কিন্তু কথাটা একটু সূক্ষ্ম ও গভীর ভাবে গ্রহণ করিলে প্রতীত হইবে যে একজন গ্রন্থকারও প্রকারান্তরে সমালোচক। তবে তিনি কোন গ্রন্থবিশেষের সমালোচক না হইতে পারেন;—প্রকৃতিই তাঁহার সমালোচ্য বিষয়। প্রকৃতির সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখেন, আর সচরাচর সঙ্কীর্ণ অর্থে যাঁহাকে সমালোচক বলা যায়, তিনি সেই গ্রন্থের সমালোচনা করেন। ফলতঃ মূলে উভয়েরই কার্য্য—সমালোচনা।

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকৃতির সমালোচনা স্ফুট কি অস্ফুট হইল, প্রকৃত কি অপ্রকৃত হইল, উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট হইল,—সমালোচক তাহারই বিচার করেন এবং গ্রন্থের যে যে স্থল জটিল বা অস্ফুট থাকে, তাহার সরল ব্যাখ্যাদ্বারা সাধারণ বুদ্ধির অধিগম্য করেন। অবশ্য গ্রন্থকারের 'সমালোচনা' হইতে সমালোচকের সমালোচনপ্রণালী ভিন্ন হইবে। অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রকৃতির সমালোচনা করিতে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করেন, সমালোচককে গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে না হইতে পারে, কিন্তু প্রণালী বা পদ্ধতির বিভিন্নতাসত্ত্বে 'সমালোচনা' একই পদার্থ।

প্রকৃতিসমালোচনা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি,—অতএব গ্রন্থেরও উৎপত্তি। মনুষ্যাদির কার্য্য সমালোচনা হইতেও গ্রন্থের উৎপত্তি। মনুষ্যাদির কার্য্য অবশ্য প্রকৃতির বহির্ভূত নহে, তবে প্রভেদ এই যে, মূলপ্রকৃতির শৃঙ্খলা ভ্রমশূন্য ও পূর্ণ, মনুষ্যাদির কার্য্য ভ্রমসঙ্কুল ও অপূর্ণ। গ্রন্থ মনুষ্যকৃত, সুতরাং ভ্রমসঙ্কুল ও অপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। ভ্রমশূন্যত্ব ও পূর্ণত্বের সমালোচনা ভ্রমসঙ্কুলতা ও অপূর্ণতার সমালোচনা হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র প্রকৃতিসম্পন্ন। সমালোচনার এই প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যই গ্রন্থকার ও সমালোচকের পার্থক্যের কারণ। মূলতঃ উভয়েই সমালোচক। গ্রন্থকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিয়া তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সমালোচকও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। পার্থক্য এই যে, গ্রন্থকার প্রকৃতির অক্ষরে অক্ষরে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য, যেহেতু তাহা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য; আর সমালোচককে গ্রন্থের সেই সেই অংশ বা সন্নিস্থলের ব্যাখ্যা

করিতে হয়,- যাহা অপেক্ষাকৃত জটিল বা অস্ফুট ও সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য। সমালোচক একপক্ষে সাধারণ ব্যাখ্যাদ্বারা সমগ্র গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন, আর পক্ষান্তরে গ্রন্থের যে যে স্থলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন সেই সেই স্থলের বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। তদ্ভিন্ন সমালোচককে আরও কিছু করিতে হয়,—তাহা গ্রন্থের বিচার। গ্রন্থের দোষ, গুণ, উপযোগিতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও সমালোচকের বিচার্য্য। গ্রন্থকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেন, এই ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের স্বরূপ ও গুণের ব্যাখ্যা,—ভ্রমসঙ্কুলতা বা অপূর্ণতার বিচার নহে। যখন পদার্থের সমগ্র স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তির কারণ সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, তখন তাহার অপূর্ণতা বা অনুপযোগিতা মনুষ্যজ্ঞানের বিচারাধীন হইতে পারে না। অতএব গ্রন্থকার 'প্রকৃতির' স্বরূপনিচয়েরই ব্যাখ্যা করেন; প্রাকৃতিক কার্য্যকারণসম্বন্ধেরই আলোচনা করেন, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার ভ্রমপ্রমাদের বিচার করেন না, যে হেতু তাহা অনায়ত্ত। ভ্রমসঙ্কুলতা বা অপূর্ণতাঘটিত যে কিছু বিচার গ্রন্থকারকে করিতে হয়, তাহা মনুষ্যের কার্য্য বা সংকীর্ণ প্রকৃতি, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার সহিত তাহার কদাচিৎ সম্বন্ধ আছে। এতদ্দ্বারা, প্রকৃতির ব্যাখ্যা ও বিচারের সহিত কোন গ্রন্থবিশেষের বিচার ও ব্যাখ্যাগত যে পার্থক্য অথবা গ্রন্থকারের সহিত গ্রন্থ-সমালোচকের সমালোচনাঘটিত যে বিভিন্নতা তাহা অংশতঃ বুঝা যাইতেছে।

গ্রন্থকার প্রকৃতির প্রথম সমালোচক আর গ্রন্থসমালোচক—দ্বিতীয়। প্রকৃতিসমালোচনা হইতে যেমন গ্রন্থের উৎপত্তি ও তেমনই সেই গ্রন্থসমালোচনা কবিপ্রকৃতিসমালোচনার আবশ্যক, নতুবা গ্রন্থের বিশদরূপ ব্যাখ্যা ও দোষগুণ বিচার করা অসম্ভব।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গ্রন্থমাত্রেই কি সমালোচনাসম্ভূত আর গ্রন্থকারমাত্রেই প্রকারান্তরে সমালোচক? গভীররূপে বিবেচনা করিলে তাহাই প্রতীত হইবে। গ্রন্থসকলকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কাব্য। প্রথম দুই শ্রেণীর গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। কাব্যগ্রন্থসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই হইবে। কাব্য কবিকল্পনাসম্ভূত, অতএব তাহার মধ্যে আবার সমালোচনা কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে 'কাব্য' কি,—কথাটা স্থির হইলে ভাল হইত। কিন্তু তদ্বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। কাব্য ও কবিতার লক্ষণসম্বন্ধে নানাজনের নানামতসত্ত্বেও তাহার সৌন্দর্য্যপ্রবণতার প্রতি কাহারও সন্দেহ নাই। হৃদয়তা ও সৌন্দর্য্য বিহীন যাহা কিছু, তাহা কবিতা নহে। কবিতা কুসুমপ্রসূনবৎ মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তি, চিন্তাশক্তি, ভাষা ও জ্ঞানের সারসৌরভ বহন করে। কবি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যথাযথ চিত্র করেন, পক্ষান্তরে তেমনি অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন। ফলতঃ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ও চরমোৎকর্ষসৃষ্টিই কবির কার্য্য। এ কার্য্যসম্পাদনে কবির [illegible]

অবশ্য তাঁহার প্রধান সহায়। প্রতিভা ভিন্ন কখনই এরূপ কার্য্য সম্ভবে না। কিন্তু এস্থলে প্রতিভার কথা হইতেছে না। প্রতিভা যদ্দ্বারা ও যাহা লইয়া কার্য্য করে, তাহারই কথা হইতেছে। কবি প্রতিভা-শক্তিসম্পন্ন, তজ্জন্যই তিনি সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির গভীর সমালোচন ভিন্ন এই সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সৃষ্টি-ক্ষমতা অবশ্য কবির প্রতিভাগত নিত্য, কিন্তু তাঁহার দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা অপরত্ব নহে। প্রকৃতিতে যাহা আছে, তিনি তাহা বই বৈচিত্র্য দেখান, সুতরাং তিনি প্রকৃতি সমালোচনা করিতে বাধ্য। কবিকল্পনা সর্ব্বত্রই প্রকৃতির অনুকারী। আলোচনা ভিন্ন অনুকরণ সম্ভবে না। মনুষ্যপ্রকৃতি-সম্বন্ধে সেক্সপিয়রের অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা মনুষ্যপ্রকৃতির গভীর সমালোচনারই ফল,—যেহেতু সমালোচনা ভিন্ন জ্ঞানমাত্রই অসম্ভব। সেক্সপিয়র একপক্ষে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞ, পক্ষান্তরে তেমনি অতুলপ্রতিভাসম্পন্ন, তজ্জন্যই তিনি জগতের অদ্বিতীয় কবি। এস্থলে সমালোচন-শক্তিকে প্রতিভা হইতে আমরা পৃথক করিতেছি না, প্রত্যুত সেক্সপিয়রের সূক্ষ্ম সমালোচন-শক্তি তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্ভূত, ইহাই বলিতেছি। তবে সমালোচনশক্তিসম্পন্ন হইলেই যে কবিজনোচিত প্রতিভা থাকিবে তাহা নহে। সমালোচন-শক্তি প্রতিভার অন্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু কবিজনোচিত প্রতিভা সমালোচন-শক্তির অন্তর্ভূত হইতে কদাচিৎ দেখা যায়। এই স্থলেই কাব্য-লেখক ও কাব্যসমালোচকে অবিচ্ছিন্ন পার্থক্য। কাব্য সমালোচক কবিতার ব্যাখ্যা করেন,—সৌন্দর্য্যের অস্ফুট অংশ প্রস্ফুট করেন,—কবির ন্যায় তীক্ষ্ণরূপে কবিতা অনুভবও করিতে পারেন, হয়ত কবি সৌন্দর্য্যের যে গভীরতম অংশে নিজে প্রবেশ করেন নাই, তাহাতেও নিমগ্ন হইয়া কবিতার অন্তস্তলনিহিত রসের আবিষ্কার করেন। এতদ্ভিন্ন কাব্যের দোষ ও অপূর্ণতা দেখাইয়া দেন এবং যদ্দ্বারা উহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত, বিচার করিয়া তাহাও নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। সমালোচক এ সমস্তই ন্যূনাধিকভাবে করিতে পারেন, কিন্তু কবিজনোচিত প্রতিভাশালী না হইলে কবিতাসৃষ্টি করিতে পারেন না,—কবি হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে কবি হইলেই যে উৎকৃষ্টরূপে গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে সমর্থ হইবেন তাহারও কিছু অর্থ নাই। কবি প্রকৃতিকে অবিচ্ছিন্ন ও মৌলিক অবস্থায় যেরূপ সমালোচন করিতে সমর্থ, প্রকৃতির প্রতিকৃতির সমালোচনা করিতে তাদৃশ পারদর্শী না হইতে পারেন। কবি, প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া কাব্য-রচনা করিতে যেরূপ সক্ষম, নিজের বা অন্যের রচিত কাব্য সমালোচনা করিতে সেরূপ সমর্থ না হইতে পারেন। মূল পদার্থের সমালোচনা ও তাহার প্রতিকৃতির সমালোচনা উভয়ই মূলতঃ সমালোচনা হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রণালী ও প্রক্রিয়াগত পারস্পরিক বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। যেমন গ্রন্থ-সমালোচক-কর্ত্তৃক গ্রন্থকারের কার্য্য সম্পাদিত না হইতে পারে, তেমনি গ্রন্থকারের দ্বারা গ্রন্থসমালো-

চকের কার্য্যও সুসম্পন্ন না হওয়া সম্ভব। তবে ইহা বলা অবশ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে যে, গ্রন্থকার হইলেই গ্রন্থসমালোচক হইতে একবারে অপারক হইবেন বা সমালোচক হইলেই ভাল গ্রন্থকার হইতে পারিবেন না। গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমালোচক একাধারে উভয়ের সমবায় হওয়াও অসম্ভব নহে। বঙ্গীয়সাহিত্যক্ষেত্রেই এই সমবায়ের উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। বঙ্কিমবাবু সুকবি ও সূক্ষ্মদর্শী কাব্যসমালোচক, একাধারে উভয়েরই আদর্শস্থল। (১)

উপরে যে কথাগুলি বলা হইল, তদ্দ্বারা গ্রন্থকারের সহিত গ্রন্থসমালোচকের সম্বন্ধ কি বুঝা যাইতে পারে। স্বস্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে সময়ে সময়ে গ্রন্থকার ও সমালোচকে বিবাদ হইতে দেখা যায়। এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ কিছু কৌতুকজনক। সমালোচক কর্ত্তব্যানুরোধে সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি সময়ে সময়ে একটু তীব্র-কটাক্ষ করিতে বাধ্য হন, অনেক গ্রন্থকারের উহা সহ্য হয় না। সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায় হউক, গ্রন্থকার সমালোচকের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। সমালোচকদিগের সহিত গ্রন্থকারদিগের মৌলিক সম্বন্ধঘটিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। গ্রন্থকার বলেন,—"সমালোচক, তুমি যে আজ গর্ব্বিতভাবে বিচারকের উচ্চমঞ্চে বসিয়াছ ও সাহিত্যসংসারে স্বকীয় আধিপত্যসংস্থাপনার্থে অবিরত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছ ইহা যার পর-নাই লজ্জাকর। তোমাকে ঐ শাসনদণ্ডটী কে দিল? বিচারের সত্বাধিকার তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? গ্রন্থকারদিগের সহিত তোমার মূলতঃ কি সম্বন্ধ, তাহা কি তুমি একবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি যে শব্দালঙ্কার-ব্যাকরণ, রূপ রস রুচি, ছন্দঃ ও ভাবাভাবের অযুত কোটী নিয়ম সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বিবেচনা করিতেছ, এই সকল নিয়মের উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহা কি তোমার আদৌ মনে নাই? তোমার যে কিছু শিক্ষা, যে কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যে কিছু জ্ঞান-গরিমা সমস্তই যে গ্রন্থকারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত! তুমি গ্রন্থকারের মন্ত্রশিষ্যমাত্র। গ্রন্থকার তোমার গুরু ও নিয়মদাতা। গ্রন্থকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, গ্রন্থকারের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, তুমি আজ গ্রন্থকারদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, গ্রন্থকারদিগের উপর বিধিব্যবস্থা চালাইতে সাহসী হইতেছ,—ইহা তোমার সামান্য স্পর্দ্ধা নহে! গ্রন্থকার সংসারের যাবতীয় বস্তুর বিচার করিবেন আর তুমি সেই বিচারের ব্যাখ্যা ও শ্রেণিনির্দ্দাচন করিবে,—প্রথম হইতেই তোমার সহিত এই বন্দোবস্ত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধনে আর তোমার মন নাই, গ্রন্থকারদিগের কুৎসা ও গ্লানি প্রচার করাই কেবল তোমার এক্ষণে একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারগণ তোমার কথায় ভ্রূক্ষেপও করেন না। তোমার অন্যায় অসঙ্গত ও বিরক্তিজনক নিয়মে তাঁহারা কখনই আর্য্য [illegible]

(১) বলা বাহুল্য যে, অধুনা বাঙ্গালাসাহিত্যে যে প্রকৃতির সমালোচনা দেখা যায়, তাহা ইংরেজী-সাহিত্যমূলক ও তাহারই অনুকরণ। ইংরেজী সমালোচনার সাময়িক পরিবর্ত্তনের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচন-প্রণালী ও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রবন্ধের অন্যস্থলে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

এখনও বাধ্য নহেন। তুমি 'আত্ম-আবশ্যকতা'-স্থাপন করিবার জন্য যতই লালায়িত হও না, যতই চীৎকার কর না, গ্রন্থকার কোন নিয়মবিশেষের বশবর্ত্তী হইবে না, কেবলমাত্র 'প্রকৃতি ও প্রতিভার' প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গ্রন্থরচনা করিবেন।"

গ্রন্থকারের এবম্বিধ উক্তিতে সময়ে সময়ে সমালোচকের আত্মাভিমান স্বভাবতই আঘাত প্রাপ্ত হয়। তিনি অধীর ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন ও সহসা গ্রন্থকারের সহিত অযোগ্য দ্বন্দ্বেও প্রবৃত্ত হন। সমালোচক বলেন,—"সাবধান, গ্রন্থকার, সাহিত্যের যাহা কিছু গৌরব সমস্তই সমালোচকসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছে, অতএব সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহারাই প্রবল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সাহিত্য তাঁহাদিগের দ্বারা উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সুতরাং চিরকালই তাঁহাদের দ্বারা শাসিত হইবে। সাহিত্যসম্বন্ধে তাঁহারা যে কিছু বিধি-ব্যবস্থা করিবেন, গ্রন্থকারদিগকে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা পালন করিতে হইবে, কেহ অবাধ্য হইলে তাহাকে অধঃপাতের অন্তস্তলে প্রেরণ করিব। আঃ! গ্রন্থকার, তোমার মত অনেককে, সমালোচক দেখিয়াছে,—অনেককে ডুবাইয়াছে। সমালোচকের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-লাভার্থে তোমার ন্যায় অনেকে গৃহ-মার্জ্জার বৎ অশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াও অনবরত সাহিত্য-সংসারের গৃহ হইতে আঁস্তাকুড়ে,—আঁস্তাকুড় হইতে গৃহে 'গতায়াত' করিতেছে। সমালোচক বলিলেই তুমি 'গ্রন্থকার'; অতএব তোমার নামেরই অস্তিত্ব আছে। তুমি প্রতিভাশালীই হও, আর স্বাধীনভাবেই লেখ, কখনই সমালোচকের ক্ষমতার অতীত নহ। অতএব অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক কি? তোমার সাধারণ নামটীও সমালোচকের হস্তে—ইহাই যেন স্মরণ থাকে"।

এই প্রকৃতি-বিসম্বাদ নানা আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন 'পরিচ্ছদে' কোন কোন গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে সময়ে সময়ে, হইতে দেখা যায়। কখন গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সমালোচকের 'সং' বাহির করিয়া পরিহাস, রসিকতা ও ব্যঙ্গচ্ছলে তাহার নানারূপ লাঞ্ছনা করেন। পক্ষান্তরে সমালোচকও গ্রন্থকারকে ছাড়েন না;—সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইলেই গ্রন্থকারের অভদ্রতা 'সুদে আসলে' প্রত্যর্পন করেন। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে এইরূপ অর্থশূন্য বিবাদের দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক বাঙ্গলাসাহিত্যেও সময়ে সময়ে গ্রন্থকার ও সমালোচকে 'সংঘর্ষণ' উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আমাদের অধুনাতন অনেক পুস্তকপ্রণেতা সংবাদ ও সাময়িক পত্রকৃত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়' বিশেষ বিরক্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য বিরক্ত হইবার কারণও আছে। কেহ কেহ এই বিরক্তি মনে মনেই রাখেন, কেহ বা সময়ে সময়ে সমালোচকদিগকে বিদ্রূপচ্ছলে তাহা প্রকাশ করিয়া মনের জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, জনৈক গ্রন্থকার, কিছুদিন হইল,—কোন মাসিকপত্রের সমালোচনার সমালোচন করিয়া স্বরচিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্যে বিলক্ষণ পরিহাস ও রসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের অনেকের প্রতি অস্মদ্দেশীয় সম্বাদ ও সাময়িকপত্র-সম্পাদকদিগের 'অন্যায় ও

নিষ্ঠুর ব্যবহারের' কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল এতৎসম্বন্ধে 'বান্ধব'পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক বাঙ্গালা-গ্রন্থের সমালোচকদিগকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রসিকতা ও বিদ্রূপের 'ছড়া-ছড়ি' করিয়াছিলেন। (১)

গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমালোচকের এইরূপ বিরোধ কখন কখন সাধারণ্যে কিয়ৎপরিমাণে আমোদজনক হইলেও তদ্দ্বারা অনেক সময়ে বিষম অনিষ্টোৎপন্ন হইতে পারে। এই অনিষ্টের বিষয় আমরা প্রস্তাবের অপরাংশে আলোচনা করিব।

(১) ইঁহার সরস শ্রেণিবিভাগ আমরা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম,

১ম। ঝকিন বা 'বাটী ভেঙা' সমালোচনা। এই সমালোচনায় গ্রন্থের আগা গোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেখকের সম্মুখে সংগৃহীত হয়, লেখকের জন্মদাতা ও শিক্ষাদাতার ভর্ৎসনা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

২য়। আইরিশ সমালোচনা। ইহাকে সামান্যতঃ 'ফেড দেম' বৈদে বাঁচি' বলে। সমালোচক অজ্ঞতা-বশতঃ গ্রন্থ না বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে গ্রন্থকারকে গালি দেন। কিন্তু আইরিশ বিষহীন সর্পের ন্যায় তাহাতে লেখকের অঙ্গে আঁচড়টীও লাগে না।

৩য়। বাক্তালীয় সমালোচনা। ইহাতে গ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। শিরস্থানে বা টীকায় গ্রন্থের নামমাত্র ধৃত হইয়া সমালোচনাতে সমালোচকের যত বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, সমুদয়ই খরচ করিতে হয়। এরূপ সমালোচনার আবিষ্কর্ত্তা বার্ড সেকলে।

৪র্থ। গ্রন্থাবরণস্পর্শী বা 'ছাদোন চস্কা'। টাইটল 'পেজ—বড় জোর বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া এরূপ সমালোচনা করা হয়।

৫ম। মাক্ষিক সমালোচন। মক্ষিকাগণ যেরূপ ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ প্রদর্শন করিতে হয়। (টীকা)—একনত্র সমালোচন। ইহাতে স্বসম্পর্কীয় হইলে কেবল গুণ, অপরের পক্ষে কেবল দোষ দেখাইতে হয়।

৬ষ্ঠ। মুরুব্বিগিরি। সমালোচক খড়্গহস্ত না হইয়া মৃদুভাবে গ্রন্থকারকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করেন এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তাদৃশ দোষ না করেন, এজন্য তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন।

এই শ্রেণিবিভাগ, কিয়ৎপরিমানে বিদ্রূপপ্রিয়তা ও পরিহাস রসিকতার বশে হইলেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা নিতান্ত ভিত্তি শূন্য নহে। প্রবন্ধলেখক প্রত্যেক শ্রেণীর সমালোচনার এক একটী নমুনা দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করি নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলেই উল্লিখিত ছয় প্রকার সমালোচনার দৃষ্টান্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রের 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন' স্তম্ভ হইতে নিজেই বাহির করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধলেখকের কোন কোন কথার সহিত আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণে ঐকমত্য থাকিলেও তাঁহার সকল কথা আমরা অনুমোদন করি না। বিশেষতঃ তিনি গ্রন্থকারের সহিত সমালোচকের সাধারণতঃ যেরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের আদৌ সহানুভূতি নাই। তিনি গ্রন্থকারের পক্ষ সমর্থনকারী, সুতরাং কেবল গ্রন্থকারের পক্ষেই ওকালতী করিয়াছেন ও গা জোরী কথাদ্বারা সমালোচককে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অধীন প্রমাণিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধসম্বন্ধে 'বান্ধবের' সুযোগ্য সম্পাদক যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এই,—"গ্রন্থকারদিগের সহিত সমালোচকদিগের বিরোধ কিসে, আমরা বুঝিতে পারি না। গ্রন্থকারেরাও জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের সীমা বিস্তার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিতে অভিলাষ করেন, সমালোচকদিগেরও ইহাই আন্তরিক অভিলাষ। আমরা প্রস্তাবলেখকের সঙ্গে

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সমালোচকের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয় আমরা যাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়ের মধ্যে একের তুলনায় অপরের কার্য্যকারিতা ও আবশ্যকতা কোন অংশে ন্যূন নহে। স্ব স্ব কার্য্যের গুরুত্বানুসারে উভয়েরই সমানরূপ প্রধান্য—উভয়েই সমানরূপ শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের সৃষ্টি, বিকাশ ও উন্নতি গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়েরই কার্য্যের উপর সমানরূপ নির্ভর করে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের কেহই পরস্পরে ন্যূন নহেন। তবে যে সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটে, তাহার কারণ এই যে, ইদানীন্তন গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়েই অনেক পরিমাণে অধঃপতিত,—উভয়েই পারস্পরিক বিদ্বেষবুদ্ধি ও আত্মগরিমার আধিক্য এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমালোচক উভয়েরই যত্ন, পরিশ্রম ও প্রতিভার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য ক্রমোন্নতি লাভ করে।—এই উন্নতি গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে কে কি পরিমাণে 'অগ্রসর' করেন, তাহার কিঞ্চিদ্বিস্তার আলোচনা করা প্রয়োজন। তদ্দ্বারা একপক্ষে যেমন এই প্রবন্ধের অন্যতম অংশের ব্যাঘাত হইবে, পক্ষান্তরে তেমনি গ্রন্থকার ও সমালোচকের পারস্পরিক মৌলিক সম্বন্ধঘটিত বিরোধেরও কথঞ্চিৎ মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

ঃ—

সময় দিয়া গ্রন্থকারদিগকে শিক্ষক ও সমালোচকদিগকে ছাত্র বলি না। সেইরূপ গ্রন্থকার এরূপ অল্পই জন্মে এবং তাদৃশ ব্যক্তি গ্রন্থ প্রকটন করিলে লোকে আপনা হইতেই 'স্বাগতং' বলিয়া আদর করিয়া মাথায় তুলিয়া লয়। এক্ষণ যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে একটা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগের বিবেচনায়, গ্রন্থকারেরা গ্রাম্যব্যাপারী আর সমালোচকবৃন্দ আড়তদার। গ্রন্থকারেরা সাহিত্যের হাটে মাল পঁহুছান, সমালোচক দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া মাল চালান করেন। গ্রন্থকারেরা তাহা আবার আনিবার সময় আপনা হইতেই বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। অথবা গ্রন্থকারেরা কুলীন, সমালোচকেরা তাঁহাদিগের কুলাচার্য্য। কে কুলীন, কে অকুলীন, কার কুল গেল, কার কুল বাড়িল, তাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন"।

যোগরহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যোগ উপলক্ষ করিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা অনেক কথাই বলিলাম। ভরসা করি, পাঠকগণ এজন্য বিরক্ত হইবেন না। অতঃপর আমরা অধিকারিভেদে যোগে সিদ্ধিলাভের কালের তারতম্য ও যোগের উপযুক্ত স্থানাদি সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যোগী হওয়া বা যোগে সিদ্ধিলাভ করা, অনেকটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন সকলের সমান নহে, অর্থাৎ যোগযোগ্য শক্তিসম্পন্ন নহে, সেই জন্যই সকলে ইচ্ছা-সত্ত্বেও যোগী হইতে পারেন না। ফল, যোগারূঢ় হইলে তাহা এককালে নিষ্ফল হইবার নহে। দৈহিক ও আন্তরিক ক্ষমতা অনুসারে কেহ বা অল্পকালে, কেহ বা অধিক কালে, কেহ বা অতি দীর্ঘকালে যোগফল দেখিতে পান। এই সত্যটী মহাযোগী পতঞ্জলি স্বকৃত যোগসূত্রে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র শব্দের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, মৃদু অধিকারী দীর্ঘকালে, মধ্যমাধিকারী তদপেক্ষা অল্পকালে, এবং অধিমাত্র-অধিকারী অতি অল্প কালেই সমস্ত যোগাধিকার আয়ত্ত করিতে পারেন। অমৃতসিদ্ধি নামক গ্রন্থে এই বিষয়টী অতি পরিষ্কাররূপে বুঝান আছে। যথা,—

"ব্যাধিতা দুর্ব্বলা বৃদ্ধা নিঃসত্ত্বা গৃহবাসিনঃ।
মন্দোৎসাহা মন্দবীর্য্যা জ্ঞাতব্যা মৃদবোনরাঃ॥
এষাং দ্বাদশভির্বর্ষৈ-রেকাবস্থা ন সিধ্যতি॥
নাতিপ্রৌঢ়াঃ সমাভ্যাসাঃ সবীর্য্যাঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
মধ্যস্থা যোগমার্গেষু তথা মধ্যমযোগতঃ॥
মধ্যোৎসাহা মধ্যরাগা জ্ঞাতব্যা মধ্যবিক্রমাঃ।
অষ্টভির্বর্ষকৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥
বীর্য্যবন্তঃ ক্ষমাবন্তোমহোৎসাহা মহাশয়াঃ।
স্বস্থানসংস্থিতাঃ স্বস্থা ভবেয়ুঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ॥
সাক্ষরাশ্চ সদাভ্যাসাঃ সদা সৎকারসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্যাঃ পুণ্যকর্ম্মাণোঽধিমাত্রা হি যোগিনঃ
একাবস্থাধিমাত্রাণাং ষড়্ভির্বর্ষৈঃ প্রসিধ্যতি॥
মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্য্যা মহাগুণাঃ।
মহোৎসাহা মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্ব্বাশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
সর্ব্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্ব্বিকারা নরোত্তমাঃ।
নিষ্পন্নাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তরকৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তোমহাশয়াঃ।
তারয়ন্তি চ সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ॥
অধিমাত্রতয়া সত্ত্বা জ্ঞাতব্যাঃ সর্ব্বলক্ষণাঃ।
ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিধ্যতি॥"

যাহারা সদাসর্ব্বদা ব্যাধি-গ্রস্ত থাকে, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই, কিম্বা যাহাদের মানসিক তেজ নাই, যাহারা গৃহবাসী, অর্থাৎ যাহারা গৃহ ছাড়িয়া কোন পুণ্যতম স্থানে থাকিতে পারে না—স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, যাহাদের উৎসাহ অতি অল্প, [illegible]

নির্বীর্য্য অর্থাৎ ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী,—তাহারা যোগসম্পত্তির মৃদু অধিকারী। এরূপ মনুষ্য দ্বাদশ বৎসরেও কোন একটী যোগাবস্থা লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

যাহারা অতিপ্রৌঢ় নহে, যাহারা নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাসে রত থাকে, যাহাদের বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান (অর্থাৎ তীব্রও নহে, মৃদুও নহে, পরিষ্কারও নহে, মলিনও নহে), যাহারা যোগপথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম, যাহাদের রাগ অর্থাৎ সংসারাসক্তি বড় অধিক নহে,—এরূপ ব্যক্তিরাই মধ্যমাধিকারী। এরূপ মধ্যমাধিকারী ব্যক্তি ৮ বৎসর পরিশ্রম করিলে যোগের একতম অবস্থা আয়ত্ত বা সিদ্ধ করিতে পারে।

যাহারা বীর্য্যবান্ (অর্থাৎ যাহাদের শারীরিক বল ও দার্ঢ্যতা অধিক), যাহাদের শক্তিসম্পন্ন উৎকট উৎসাহ আছে, যাহারা ক্ষমাশীল, যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও মহান্, যাহারা একস্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে অর্থাৎ অচঞ্চলস্বভাব, যাহাদের দেহ অরোগী এবং মনও সুস্থ, যাহারা স্থিরবুদ্ধি, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, যাহারা সদাসর্ব্বদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি ও শাস্ত্রজ্ঞফলের প্রতি আদর, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে;—এরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তিকে অধিমাত্র-অধিকারী বলিয়া জানিবে। এই অধিমাত্র অধিকারীরা ৬ বৎসরের মধ্যে কোন এক সিদ্ধি-অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

যাঁহাদের প্রভূত বল আছে, যাঁহাদের [illegible] মৃদু; যাঁহাদের মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাঁহাদের গুণগ্রাম অতি প্রবল, যাঁহাদের উৎসাহ অত্যন্ত অধিক, যাঁহারা অত্যন্ত শান্তস্বভাব, যাঁহাদের করুণাগুণ বা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সুস্থির থাকে, অথবা যাঁহারা প্রতিক্ষণেই স্বীয় শুভেচ্ছাকে "অমুকের শুভ হউক" এতদ্রূপে উরোধিত করিয়া থাকেন, যাঁহারা সমুদয় যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছেন, যাহারা লক্ষণসম্পন্ন, যাঁহারা সমাঙ্গ অর্থাৎ যোগাসনাদির উপযুক্ত আকারসম্পন্ন, যাঁহাদের কোন প্রকার ব্যাধি নাই, কিছুতেই যাহাদের চিত্তবিকার হয় না, যাঁহাদের রূপ আছে এবং যৌবনও আছে, যাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই (সরল ও সুস্বভাবযুক্ত), কিছুতেই যাঁহারা ভীত হন না, বাধাবিঘ্ন যাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, কিছুতেই যাঁহারা ব্যাকুলচিত্ত হন না, যাঁহারা যোগীর কুলে কিম্বা বিদ্বানের বা সিদ্ধপুরুষের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—বুঝিতে হইবে যে, তাদৃশ মহাশয় ব্যক্তিরাই পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিলেন, যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, ইহজন্মে তাঁহারাই অধিমাত্রতর অধিকারী হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এরূপ অধিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরের মধ্যেই নিশ্চিত কোন এক যোগাবস্থা লাভ করিতে পারেন, এবং তদ্রূপ ব্যক্তিরাই অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ।

যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থানাদি। গৃহে থাকিয়া প্রথমতঃ গুরুর নিকট যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতেও শিখিবে। পাতঞ্জলদর্শ-

নের সাধনপাদে যে সকল সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে, সেই সকল সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিবে। যখন দেখিবে যে, শরীর ও মন প্রায় নির্দ্দোষ হইয়াছে, অনুষ্ঠেয়সকল আয়ত্ত হইয়াছে, তখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন এক শুভস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। এই বিধিটী বাশিষ্ঠযোগ ও যাজ্ঞবল্ক্যীয় যোগসংহিতা,—এই দুই গ্রন্থে বিস্পষ্টবিধানে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

কৃতবিদ্যোজিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারোবিদ্বাংশ্চ সুশিক্ষিতঃ।
যমাদিগুণসম্পন্নঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
শুভদেশন্তুতোগত্বা ফলমূলোদকান্বিতম্।
তত্রস্থে চ শুচৌ দেশে নদ্যাং বা কানন-
নেঽপিবা॥
সুশোভনং মঠং কৃত্বা সর্ব্বকক্ষাসমন্বিতম্।
ত্রিকালস্নানসংযুক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ॥
মস্তকন্তুতনুগ্রীবঃ সিতভস্মধরঃ সদা।
মৃদ্বাসনোপরি কুশান্ সমাস্তীর্য্যাঽথবাঽ-
জিনম্॥
ইষ্টদেবং গুরুং নত্বা তত আরুহ্য চাসনম্।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোবা জিতাসনগতঃ স্বয়ম্॥
সমগ্রীবশিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগম-
ভ্যসেৎ॥

প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা, অনন্তর ক্রোধজয়, তৎসঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, তৎসঙ্গে গুরুসেবা করা এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করা অতীব কর্ত্তব্য। (শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে গুরুসেবা ও পিতৃমাতৃ সেবায় রত থাকিলে ভক্তিবৃত্তি প্রবল ও দৃঢ় হয়, তদ্দ্বারা যোগশিক্ষার বিশেষ উপকার সাধিত হয়)। এই সময়ে গৃহাশ্রমে থাকিয়া সদাচারপরায়ণ হওয়া উচিত এবং জ্ঞানীর কিম্বা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যমনিয়মাদি যোগসাধক গুণসকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। তথাকার কোন এক শুচি অর্থাৎ পবিত্রস্থানে অথবা নদীসমীপস্থ কিম্বা অরণ্যান্তর্গত মনোরম প্রদেশে, মনস্তুষ্টিকর একটী মঠ (বাস কুটির) প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে থাকিয়া ত্রিকালস্নায়ী, শুচিস্বভাব, একাগ্রচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি ও শুভ্রভস্মধারী এবং আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করিবেক। কুশ কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন (সিদ্ধাসন বা পদ্মাসন) বদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট হইবেক। অনন্তর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় (গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক্ সমান রাখিতে হইবে, যেন নত, আনত অথবা তির্য্যক্ নত অর্থাৎ বক্র না হয়), হইয়া আস্য সংবৃত (মুখ বিবৃত না থাকে) এবং শরীর নিশ্চল রাখিবেক। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে ধৃত থাকে। এরূপভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান, অথবা ধারণাদি অভ্যাস করিবেক।

যোগচিন্তামণি-গ্রন্থের বিধান-অনুসারে অগ্রে কোমলকুশা, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্রাচ্ছাদন,—এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগাভ্যাস করা উচিত।

অন্য এক যোগী বলেন যে, যোগসাধনার জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা

আশ্রয় করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। মনের অনুকূল ও নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া যোগাভ্যাস করা যাইতে পারে। "রাত্রিশেষে নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি" ইত্যাদি প্রকার উপদেশবাক্য থাকায় প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের, এবং রাত্রিশেষ ও মধ্যরাত্র ধ্যানের অত্যুত্তম কাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক সুস্থতা কিছু অধিক থাকে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থে কিছু বিশেষবিধি দৃষ্ট হয়। যথা,—

"আদৌ স্থানং ততঃ কাল-মিতাহারস্ততঃ পরম।
নাড়ীশুদ্ধিস্তৎপশ্চাৎ তস্মাত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধানৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জ্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটিরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিহ্রস্বঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতম।
সম্যক্ গোময়লিপ্তঞ্চ কুড্যরন্ধ্র বিবর্জ্জিতম্॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥"

প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার, সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থান বলা হইয়াছে, এক্ষণে নিষিদ্ধ স্থানগুলি শুনুনঃ—দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতিস্থান হইতে সমধিক দূরস্থান; অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যবিহীন বন; রাজধানী এবং জনতাপূর্ণস্থান;—এমন সকল স্থানে থাকিয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। করিলে সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বিঘ্ন ঘটিতেও পারে। দূরদেশে গিয়া যোগশিক্ষা আরম্ভ করিলে অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, অরণ্যে গিয়া যোগারম্ভ করিলে ভক্ষ্য-অভাবে বিঘ্ন হইতে পারে, জনতাপূর্ণ স্থানে যোগারম্ভ করিলে প্রকাশ হইলে বিবিধ বিঘ্ন ও উপসর্গ জন্মিতে পারে, এই হেতু, ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া করিয়া কোন এক মনোরম প্রদেশে, ধার্ম্মিক রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্যলাভ হয় অথচ কোন উপদ্রব সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিবেক। ঐস্থান সুপরিস্কৃত ও গোময়লিপ্ত থাকিবেক, এবং তাহার দেওয়াল অথবা বেড়া ছিদ্রবহিত করিবেক। তদ্রূপ গুপ্তস্থানে থাকিয়া, যোগাভ্যাস করিলে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করা যায়। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐসকল ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বর্ষার মেঘ।

নিদাঘ পীড়িত তপ্ত বসুমতী
শীতল করিয়া সলিল পাতে,
ফল-ফুল-শস্যে ভেটিতে ধরণী
ধেড়াই আমরা পবন-পথে।

বহুদূরে থাকি, দূর-দৃষ্টি রাখি,
সন্ সন্ ক'রে বহিয়া যাই,
প্রতপ্ত প্রদেশ দেখিলে অমনি
হৃদয়ের ভারে থেমে দাঁড়াই,

নেমে গিয়ে তবে ধরণীর কাছে
ঝম্ ঝম্ ক'রে ঢেলে দি' জল,
আত্ম-দেহ-নাশ ?— তবু কত সুখ।—
ধরণী তখনি হয় শীতল।

খর রবি-তাপে তরুলতাগুলি
ক্রমে ক্ষীণতর বিষাদময়,—
ঢেলে দিলে শিরে সুশীতল জল,
ভিজিয়া ভিজিয়া প্রফুল্ল হয়।

বিষম উত্তাপ।— গায়ের জ্বালায়
পশুপাখিগুলি কাতরপ্রাণ ;
গা বেয়ে পড়িলে, নব-মেঘ-জল
শরীর কাঁপা'য়ে সমাধে স্নান।

আধ ফোটা কলি হুতাশে শুকায়,
ক্ষীণ লতিকায় বিষাদে কাটে,—
বরষার জলে মিটা'য়ে পিপাসা
প্রাণভ'রে হেসে ফুটিয়ে উঠে।

ফলশস্যবিনে ধরা মরুময়,—
কাতর ভুবন আকাশ চাই',
দেখিতে না পারি সে ভাব তা'দের
অমনি গলিয়া পড়িয়া যাই।

ভালবাসি মোরা তরুলতাগুলি,
আধেক ফুটন্ত কুসুমদল,
আকাশের পাখী, কাননের পশু,—
সমানে সমগ্র ধরণীতল।

তাই সে অভাব-অনুভবকারী
যাইতে যাইতে দেখিলে কা'রে,
পর-দুখে কাঁদি,—সাধি আত্ম নাশ—
ঢেলে দিই জল অজস্রধারে।

হইনু বা ক্ষয় ?—ক্ষতি কি তাহায় ?—
বিনাশে ত কা'রে করি না দুখী !—
ভালবাসা মোরা চাহি না কাহারো ;
ভাল বেসে মোরা নিজেই সুখী।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আর্য্যধর্ম্মসার। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বেদ, স্মৃতি, মনু, উপনিষৎ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণসহ উদ্ধৃত ও প্রণীত এবং তৎকর্ত্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগ, সাকবাইল হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা ১২৮৯।

প্রথমতঃ,—সমালোচ্য গ্রন্থের আবরণ পৃষ্ঠা হইতে উপরে যে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের কিরূপ অন্বয় হইবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই, দ্বিতীয়তঃ—পুস্তকখানির নামের কিরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, এই পুস্তক পাঠ করিয়া,তাহাও বুঝিতে পারি নাই। 'আর্য্য'শব্দে আজকাল কেবল হিন্দুজাতি বুঝায় না, অন্যান্য দেশীয় লোকদিগকেও বুঝায়। গ্রন্থকার 'আর্য্য'শব্দ উহার ভাবার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, এমত বোধ হয় না, এবং 'আর্য্য' বলিতে কাহাদিগকে বুঝায় তাহাও স্পষ্ট বলিয়া দেন নাই। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মুসলমান,—এই কয়টী ধর্ম্মেরই অল্পাধিক উল্লেখ করিয়াছেন এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে অন্যান্য ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহাও প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং 'আর্য্যধর্ম্ম' বলিতে কেবল হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব কিম্বা অন্যান্য ধর্ম্ম—যাহা গ্রন্থকারের মতে হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—তাহাদিগকেও বুঝাইবে, ইহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই। পরন্তু গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তান' ও 'আপনাদের আর্য্যধর্ম্ম' পদের প্রয়োগ আছে। 'ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তান' বলিলে অন্য দেশীয় 'আর্য্যসন্তানের' অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করা হয় এবং 'আপনাদের আর্য্যধর্ম্ম' বলাতে অন্যদের একটা 'আর্য্যধর্ম্ম' আছে, ইহা মানিয়া লওয়া হয়, অতএব জিজ্ঞাস্য এই যে, 'আর্য্যধর্ম্ম সার'বলিলে উহা যে 'হিন্দুধর্ম্মেরই সার'—ইহা কিরূপে বুঝায়? ফলতঃ, গ্রন্থকার 'আর্য্য' শব্দের প্রয়োগে বড়ই 'গোলযোগ' করিয়াছেন।

পুস্তকের উদ্দেশ্য-প্রতিপাদনকল্পে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—'আর্য্য সন্তানগণ গাঢ়তর অর্জ্জনস্পৃহার বশীভূত হইয়া, স্ব স্ব আত্মজগণকে শিশুকাল হইতে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার্থ স্কুলে প্রেরণ করেন। তাহারাও বাল্যাবধি এইরূপ ভাষা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তদানুষঙ্গিক আচারব্যবহারাদিতে ক্রমে দীক্ষিত হইতে থাকে। এইরূপে উত্তরোত্তর বিজাতীয় ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও তাহাদের সংসর্গগুণে কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম,—কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম কল্পনায় স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মকে অতি পবিত্র বোধে ইহারই অন্যতরকে অবলম্বন করে, না করিবেই বা কেন? যখন তাহারা স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মের কিছুই অবগত হইতে পারে না, তখন আপনাদের আর্য্যধর্ম্ম উত্তম কি অধম তাহা কিরূপে

জানিত প্রাবিবেকগণ আমি ঐ সকল গুরুতর ভ্রম সংশোধন করার মানসে (বামনের চাঁদ ধরার আশার ন্যায়) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিলাম।'

গ্রন্থকারের আশা যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলে কি হইবে—আমাদের স্বল্পগামী, 'আত্মনগণ' বড়ই, অসৎ ও কুটতার্কিক। সেই অসৎ ও কুটতার্কিকদিগের ভ্রমসকল যে সমালোচ্যগ্রন্থদ্বারা সংশোধিত হইবে, আমাদের এমত ভরসা হয় না। পরন্তু 'অজ্ঞজনের আশা' ফলবতী করা' এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা অজ্ঞ, আমাদের 'আশা' ত এতদ্দ্বারা ফলবতী হইল না, তবে অভিজ্ঞের যদি হয় সে স্বতন্ত্রকথা। 'আর্য্যধর্ম্মসার' যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকারের নিজের ভাষাতেই বলা ভাল। 'ইহাতে আর্য্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিভেদের কারণ, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ধর্ম্মের সারমর্ম্ম, সাকার উপাসনার কর্ত্তব্যতা এবং সাকার উপাসনার প্রণালী, জপের নিয়ম, সৃষ্টিপ্রকরণ, গুরুসন্নিধানে দীক্ষা হওয়ার আবশ্যকতা, ষট্‌চক্রের ভাষা ও জ্ঞানার্জ্জনের হেতু, ব্রহ্মনিরূপণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রকার' ইত্যাদি'। বিষয়গুলি বড় কম নয়, কিন্তু যেরূপ ভাবে, যেরূপ ভাষায় ও যেরূপ যুক্তিসহযোগে উহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা 'অজ্ঞের আশা ফলবতী' হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, গ্রন্থকার যখন সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন ও তাহা করিতে পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ।

দেহরক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ দাস প্রণীত। কলিকাতা। সন ১২-৯০ সাল।

মনুষ্যশরীর একে 'ক্ষণভঙ্গুর,' তাহার উপর আবার 'ব্যাধিমন্দির'। ক্ষণভঙ্গুর দেহকে ব্যাধি হইতে রক্ষার্থে মনুষ্য নানা উপায় ও ঔষধ উদ্ভাবন করিয়াছে। ব্যাধি সংখ্যার যেমন ইয়ত্তা নাই, ঔষধসংখ্যাও তেমনি অসংখ্য—চিকিৎসাপ্রণালীও তেমনি বিবিধ প্রকার। অসংখ্য ঔষধ ও বিবিধ চিকিৎসাপ্রণালী সত্ত্বেও মনুষ্য বিনাচিকিৎসায় ও বিনা ঔষধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অনেক সময়ে ও অনেক রোগে, ঔষধ ও চিকিৎসা উভয়ই ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় বলিয়াই চিকিৎসা ও ঔষধের এত প্রকার ও প্রণালী ভেদ। নির্দ্দিষ্ট ঔষধ প্রয়োগে নির্দ্দিষ্ট রোগমাত্রই যদি আরোগ্য হইত, তাহা হইলে চিকিৎসাসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইত না। যে পীড়া 'হাবিমি' চিকিৎসায় 'আরাম' হইতেছে না, তাহা হয়ত বৈদ্যক প্রণালীতে আরোগ্য হইতে পারে,—যে রোগ 'ন্যাচোপ্যাথিক' চিকিৎসার অনায়ত্ত, তাহা হয়ত হোমিওপ্যাথির আয়ত্তাধীন। পরন্তু জলবায়ু, ধাতু ও অন্যান্য অবস্থাভেদেও চিকিৎসাপ্রণালীর উপযোগিতার তারতম্য হয়। কোন স্থলে 'বৈদ্যক অপেক্ষা 'ইয়ুনানীর' উপযোগিতা অধিক হইতে পারে; অনেক স্থলে হোমিওপ্যাথিক অপেক্ষা ন্যাচোপ্যাথিক অধিকতর কার্য্যকরী হয়। তবে কোনস্থলে কোন্ প্রণালী বিশেষরূপে প্রযুক্ত ও উপযোগী,—ইহা নির্ণয় করা অবশ্য কঠিন। যাহা হউক, সকল প্রকার চিকিৎসাপ্রণালীরই যে ন্যূনাধিক উপযোগিতা

ও আবশ্যকতা আছে, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। মনুষ্যকৃত সকল কার্য্যের ন্যায়,—চিকিৎসাবিজ্ঞানও, তাহার যাবতীয় শাখাপ্রশাখাসহিত অপূর্ণ এবং কখনও পূর্ণতালাভ করিতে পারিবে, এমত আশাও অতি অল্প। কিন্তু দেহধারণে যখন রোগ অবশ্যম্ভাবী এবং রোগ হইতে দেহরক্ষা করা কর্ত্তব্য, তখন চিকিৎসাশাস্ত্র পূর্ণ বা অপূর্ণ হউক, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। যে কোন প্রণালীর চিকিৎসাই হউক, তাহার অপূর্ণতা সত্ত্বেও কার্য্যকারিতা আছে। অতএব পরীক্ষানুমোদিত চিকিৎসাপ্রকরণ, যে কোন আকারেই হউক, সাধারণ্যে বিস্তৃতিলাভ করিলেই সমাজের মঙ্গল, কেন না, নানাপ্রকারের ও প্রকৃতির চিকিৎসার অস্তিত্বসত্ত্বেও তাহা অধিকাংশ লোকের জ্ঞানের বহির্ভূত। বিনা চিকিৎসায় যত লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে, চিকিৎসাপ্রকরণের বহুল বিস্তার হইলে, তাহার সংখ্যাহ্রাস হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

চিকিৎসা দুই প্রকার। প্রথম, নিজের দ্বারা নিজের চিকিৎসা। দ্বিতীয় চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা। সমাজের সকল লোকেই চিকিৎসক হইতে, বা চিকিৎসক হইতে চিকিৎসা পাইতে সমর্থ নহে, অথচ রোগ হইতে দেহরক্ষা করা সকলেরই পক্ষে সমান আবশ্যক। এমত স্থলে স্বাস্থ্যরক্ষার মোটামোটী নিয়মগুলি যদি জানা থাকে এবং সহস্র পরীক্ষানুমোদিত সাধারণ সাধারণ ঔষধগুলির প্রয়োগদ্বারা পীড়ার অঙ্কুর হইতে হইতেই যদি তাহার দমন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে একদিকে নিজের চিকিৎসা নিজে করিয়া চিকিৎসকের সাহায্য যেমন অনাবশ্যক হয়, তেমনি কঠিনপীড়াজনিত যাতনা হইতেও সহজে নিষ্কৃতিলাভ করা যাইতে পারে। চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু কিছু জানা না থাকিলে বস্তুতঃ পদে পদে বিপদ। অনেকবারেই আজকাল, সর্দ্দী হইলেও ডাক্তার ডাকিতে হয়, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

আমাদের সমালোচ্যগ্রন্থখানিতে হোমিওপ্যাথিকমতের সরল চিকিৎসাপ্রকরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই কিয়ৎপরিমাণে উপকৃত হইতে পারিবেন। ইহাতে সহজ ও সাধারণ পীড়াসমূহের লক্ষণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ, ঔষধ ও পথ্যাদির বিষয় এবং বিবিধপ্রকার মুষ্টিযোগের কথা বেশ পরিষ্কার ও সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে। আশা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইবে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। অনেক মূর্খ লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা বা সরলচিকিৎসাবিষয়ক একআধখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া অজ্ঞলোকদিগের মধ্যে দস্তুরমত চিকিৎসাব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেয়। এ রীতি যদ্দ্বারা প্রশ্রয় না পায় ও সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয়, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। নতুবা বিনাচিকিৎসা অপেক্ষা নামমাত্রচিকিৎসাজনিত মৃত্যুসংখ্যা অধিক হওয়ারই সম্ভাবনা।

একতাব্রত;—কাব্য। বৈশাখ মাসের উপহার। শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। শকাব্দা ১৮০৬।

আজকাল'কার দিনে নিঃস্বার্থ পরোপকার ও অকৃত্রিম সহৃদয়তা নিতান্তই বিরল। এই দুই দ্রব্যের কিঞ্চিন্মাত্রও

যাঁহার অধিকারে আছে, এ সময়ে তিনি বস্তুতই বিশেষ ভাগ্যবান। 'একতা ব্রত' প্রণেতার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার বিষয় আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে তিনি যে এইরূপ 'বিশেষ ভাগ্যবান' পুরুষোচিত গুণসম্পন্ন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। দীনবাবু সাহিত্য সংসারে তাদৃশ পরিচিত না হইলেও প্রকৃত দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্য অনেকের নিকট পরিচিত। আমরা তাঁহার এই 'একতা ব্রত' নামধেয় ক্ষুদ্র পদ্য প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছি। নূতন বর্ষের প্রথম মাসে—পবিত্র বৈশাখে—পুণ্যশীলা বঙ্গাঙ্গনাগণ পুণ্যার্থে সুখমোক্ষকামনায় নানাবিধ ব্রত গ্রহণ করেন। গ্রন্থকার এই দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে 'একতা ব্রত' গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন,—

"শুভদিনে, শুভক্ষণে, লহ ব্রত একতার।
করি দৃঢ় পণ, হ'য়ে এক মন
দুঃখ দূর কর মা'র।
* * * *
জনকের সম হও ধর্ম্মে রত,
কর দৃঢ় পণ ভীষ্মদেব মত,
চারি বর্ণে মিলে হয়ে একমত
ভারত কর উদ্ধার।"

'ভারত উদ্ধার' করিতে বা স্বাধীন হইতে ঢালখাঁড়ালাটীশোটার আবশ্যক হইবে না। গ্রন্থকার বলেন,

"সাধ যদি হয়ে থাকে স্বাধীন হইতে,
সাধ যদি হয়ে থাকে বল দেখাইতে,
ব্রিটন উন্নত হ'লো যে সব গুণেতে
সেই সব প্রথমেতে হইবে শিখিতে।"

'ব্রিটনের' যে কিছু গুণ, সমস্তই তাহাদের একতাজনিত। অতএব আমাদের মধ্যে একতা সংস্থাপিত না হইলে, উন্নতিপ্রসূ গুণার্জ্জন করিয়া উন্নত হইবার আশা কোনক্রমেই করিতে পারি না। আমাদের মধ্যে আদৌ একতা নাই, অথচ স্বাধীনতার জন্য 'হৈ হৈ' করিতেছি।

"পরাধীন পরাধীন—এই এক গোল,
একেবারে ছাইয়াছে দেশ সমুদায়।
দুই সহোদরে মিল যে জাতিতে নাই,
সে জাতির আস্ফালন দেখে হাসি পায়।"

যথার্থই হাসি পায়। অপিচ—

"যাদের বসন আসে বিলাত হইতে'
বাসনও আসিবার হতেছে উদ্যোগ,
তা'রা বলে,—'পরাধীন হ'য়ে কত কাল
করিব মনের দুঃখে এত ক্লেশভোগ'।"

আমরা বস্তুতই গ্রন্থকারের এই তীক্ষ্ণ কটাক্ষের উপযুক্ত। একতার যত প্রকার অন্তরায় আছে তাহার মধ্যে 'হাম্ বড়া বাদও অন্যতম। লেখক আফিসের হেড্-কেরাণী বা 'বড় বাবু'কে 'হাম্‌বড়া'-বাদের এক উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির কিয়দংশ পাঠককে দেখাইতেছি। গর্ব্বস্ফীত 'বড় বাবু' নিজের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"বোলবোলা কত মম সাধ্য কি কহিতে?
আলবোলা রেখে গেছে চাকর আমার;
হাত উঠাইতে পাছে কষ্ট হয় মম,
মুখে তুলে দেয় নল 'মুখ' মহাশয়।"

পুনশ্চ:—

"অন্দরমহলে দেখ বিচিত্র ব্যাপার;—
রাঁধিয়াছে রামাগণ অন্ন ও ব্যঞ্জন;
আপিসের বাবুদের পরিবার তারা,
আসিয়াছে ভয়ে ভয়ে প্রতাপে আমার।"

তার পর বড়বাবুর গৃহলক্ষ্মী 'নং দোণাইয়া' সকলের উপর হুকুম ঝাড়িতেছেন। আমরা জানি, দীনবাবু নিজে একজন বড় আফিসের 'বড় বাবু', তাঁহার নিকট তাঁহার সমপদস্থ মহামতিদিগের কীর্ত্তিনিচয়ের বিবরণ শুনা আমোদজনক বটে। পুস্তকখানির লেখা স্থানে স্থানে সুন্দর হইয়াছে। ঠঃ—

মাস-সমালোচন।

শ্রাবণ মাসের বর্ষার নাম 'ধারার শ্রাবণ', কিন্তু এবৎসর বৃষ্টির নামগন্ধ নাই। নিম্নবাঙ্গালার স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্যও সম্যক রূপে চলিতে পারিবে, কিন্তু বেহার-অঞ্চলে বৃষ্টির "অকাল" পড়িয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু বৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহা যৎসামান্য। এপর্য্যন্ত রীতিমত নদীসমস্তের উচ্ছ্বাস হয় নাই, এবং পর্ব্বতনিঃসৃত বন্যারও আবির্ভাব হয় নাই। পথঘাট, খেতখোলা,—দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন [চৈত্রবৈশাখমাস সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। মেঘের অভাব নাই;—প্রত্যহই থাকিয়া থাকিয়া আকাশ অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলে; কিন্তু বৃষ্টি হইবে,—এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে মেঘ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। বেহারের মধ্যে গঙ্গার উত্তরপ্রদেশস্থ কয়েকটি জেলার অবস্থা আবার বিশেষরূপে শোচনীয়। ভাদ্রের শুষ্ক ধান্যে [illegible] 'কড়ক মড়ক' হইয়াছে; কিন্তু ধান্য যাহাই প্রজাবর্গের প্রধান আহার—তাহার আশা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। ক্ষেত্রে বীজসমস্ত শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার পর জল হইলেও বোপণ করিবার কিছু থাকিবে না। গতবৎসরও উত্তর গাঙ্গেয় কয়েকটি জেলার অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রজাদিগের সমূহ কষ্ট হইয়াছিল, কেবল গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ দুর্ভিক্ষ রটনা করিতে পারে নাই। কিন্তু এবৎসর আর রক্ষা থাকিবে না। এ বার যে বাস্তবিকই সহস্র সহস্র অনাহারমৃত্যু ঘটিবে, তাহা দিব্যচক্ষে আমরা দেখিতে পাইতেছি। হা ভারতবর্ষ। স্বর্ণগর্ভা স্বর্ণপ্রসবিনী হইয়া শেষে যে তোমার এ দুর্দ্দশা হইবে, তাহা কে জানিত? আমাদের রাজা বলেন যে, আমরা বড়ই অলস, বড়ই মূর্খ, বড়ই অসতর্ক, বড়ই "গাধা,"—তাই আমাদের মধ্যে অহরহঃ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিয়া থাকে। তাহাই হইবে।। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এমন অবস্থাতেও—এমন বিপন্ন এবং অপ-

কষ্ট অবস্থাতেও—আমরা আমাদের পিতৃতুল্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের দয়ার উদ্রেক করিতে পারিলাম না! পাকেচক্রে, সময়ে অসময়ে, ওজর বে-ওজোরে এবং কসুর বে-কসুরে শত সহস্র বাস্তা দিয়া ভারতের অর্থ যে অজস্র ভাবে ভারত হইতে অপসারিত হইতেছে তাহা যদি কিয়ৎপরিমাণেও বন্ধ করিতে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের কষ্ট অনেকটা উপশমিত হইতে পারিত। কিন্তু কান্নাকাটিই কর, আর বাকবিতণ্ডাই কর, "নর্শিরাম বেণ্ডো ছাড়িবে না"—ইংরাজ আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করিবেন না।

গতমাস মধ্যে কি সমাজ,—কি রাজনীতি উভয় সম্বন্ধেই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা অতি কম। কিন্তু একটী ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই শতের সমতুল্য। সে ব্যাপার—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির উপর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাক্রোশ আক্রমণ। মিউনিসিপালিটি এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়েই বচসা করিতে করিতে ক্রমশঃ এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন যে, এক্ষণে পরস্পরের পুনর্মিলন ও মতৈক্যতা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টই বলবান্, এবং অধিকতর সম্মানপ্রয়াসী, কিন্তু এরূপ অবিবেচনা, অবিচার ও জবরদস্তির সহিত গবর্ণমেণ্ট আপনার ক্ষমতা এবং বল চালনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেশের লোক জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদিগের পদবীর সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে। তাঁহাদিগের সহানুভূতি বরঞ্চ বিপরীত পক্ষে—মিউনিসিপালিটির উপর। ছোট লাট টমসনবাহাদুর বলিতেছেন যে, মিউনিসিপালিটী সহরের স্বাস্থ্যরক্ষণ এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা নিজে ত করেন নাই, এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর্য্যুপরি প্রদত্ত আদেশও অবহেলা করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী ইহার উত্তর দিতেছেন যে, ছোটলাটবাহাদুরের এই অভিযোগ ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত নহে, এবং সর্ব্বতোভাবে সত্যও নহে। তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্ত করিতেছেন। তাঁহাদের সেই চেষ্টার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা সহরের অনেক উন্নতিও সংসাধিত হইয়াছে। হাইকোর্টের অন্যতম জজ মাননীয় কনিংহাম সাহেব এবং বাঙ্গালার বর্ত্তমান সার্জ্জন-জেনারেল ডাক্তার পেইনসাহেব,—এই দুই ব্যক্তি প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া মিউনিসিপালিটির নামে গবর্ণমেণ্টে একখানি অভিযোগপত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই অভিযোগপত্রই এত কারখানার মূল। অভিযোগকারীরা বলিতেছেন যে, সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে মিউনিসিপালিটীর কিছুই মনোযোগ নাই। বিগত মার্চ এবং এপ্রিল মাসে সহরে যে ভয়ানক ওলাউঠা দেখা দিয়াছিল, তাহাই তাঁহাদিগের সেই অমনোযোগিতার প্রধান লক্ষণ। ছোটলাট বাহাদুর এতকাল চুপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যেমন এই অভিযোগপত্র প্রদত্ত হইল, অমনি তিনি যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া চাহিলেন এবং সহরের দুর্দ্দশাজন্য অনুকম্পায় বিগলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধও সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তিনি একবারে মিউনিসিপালিটির উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। এমন অবস্থায় ছোট-

লাটের এই অমানুষিক অনুকম্পা ও ক্রোধ বাস্তবিক আন্তরিক নহে। কেবলমাত্র কনিংহ্যাম এবং পেইন সাহেবের "খাতিরে" তাঁহার এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। ছোটলাটের প্রথম পত্রের প্রত্যুত্তরে মিউনিসিপালিটি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এ সমস্ত কথা সবিশেষ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের এবং দেশের সাধারণ লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ছোটলাটসাহেব মিউনিসিপালিটির উক্ত প্রত্যুত্তর বিবেচনা করিয়া "মেমাজ" ঠাণ্ডা করিবেন, এবং বন্ধুভাবে মিউনিসিপাল কমিশনরগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালীসম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিবেন। কিন্তু ছোটলাটবাহাদুর সাধারণের আশায় ভস্ম প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধ শান্ত হয় নাই; এবং মিউনিসিপাল আইনের ২৮ ধারার অনুযায়িক তিনি এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। হাইকোর্টের অন্যতম জজ মাননীয় বিভার্লিসাহেব উক্ত কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সহযোগী কমিশনের অপরাপর মেম্বরেরা সহরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবস্থা এবং সে অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কি কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন। ইচ্ছা করিলে, মিউনিসিপালিটিও আপন পক্ষ হইতে একজন মেম্বরকে উক্ত কমিশনের মেম্বর করিয়া দিতে পারিবেন।

এই কমিশন নিয়োগের অর্থ—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাধীনতাহরণ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে মেম্বরগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আইনমত উক্ত মেম্বরেরা অনেকাংশে স্বাধীন অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর সর্ব্বদা কাহারও হস্তক্ষেপের নিয়ম নাই; স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সর্ব্বোচ্চ, কিন্তু বিশেষ প্রকার প্রয়োজনীয়তা না হইলে উক্ত গবর্ণমেণ্টও এরূপ মিউনিসিপালিটির কার্য্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। উপস্থিত ব্যাপারে ছোটলাটবাহাদুর সেই বিশেষক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াই ২৮ ধারার মতে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির যে যথেষ্ট অপমান হইয়াছে, এবং এমন কি ইহার জন্য, সে মিউনিসিপালিটি যে সাধারণের চক্ষুতে বিশেষরূপে দোষী বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণেই পরম বিস্ময় দিত হইয়াছেন, সকলের মনেই এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, ছোটলাটবাহাদুর অন্যথা ক্ষমতা চালন করিয়াছেন, তিনি শাসনকার্য্যে স্বেচ্ছাচারিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তিনি আমাদের স্ফুটনোন্মুখ আত্মশাসনপ্রবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি যে বিশেষরূপ দক্ষতা এবং যত্নের সহিত বরাবরই আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেই যত্নের ফলে আজকালের কলিকাতা যে পূর্ব্বের তুলনায় স্বর্গে পরিণত হইয়াছে, ইহা সকলেরই বিশ্বাস। সুধু কনিংহাম এবং পেইন সাহেব কেন, সমগ্রভারতবাসী ইংরাজেরা যদি একবাক্যে এ কথা মিথ্যা বলিয়া রটনা করেন, তাহা হইলেও লোকসাধারণের সেই বিশ্বাস কখন টলিবে না। যাহা সত্য, তাহা কি করিয়া মিথ্যা হইবে?

এই বিবাদের পরিণাম কি হইবে,

তাহা চিন্তা করিতেও মনে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। কমিশনরেরা যেরূপ অপমানিত হইয়াছেন, তাহাতে সদলবলে কর্ম্মত্যাগ না করিলে তাঁহাদের সম্মান রক্ষিত হইবে না। এমন কি, ইতিমধ্যেই, আমরা শুনিলাম, প্রায় ৩২।৩৩ জন কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গৌরব ও প্রশংসনীয় আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছেন। অবশিষ্ট কয়েকজন (১০।১৫ জন মাত্র,) যদি না দেন, আজিও মিউনিসিপালিটীর মান্য কমাইতে পারেন নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে "আত্ম শাসন" ক্ষমতা প্রদান করিবেন বলিয়া শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের হস্তে সেরূপ ক্ষমতার অণুমাত্র আভাস দেখিলেও বিজাতীয় ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে থাকেন, এবং তখনই তাহা অপহরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠেন। লর্ডরিপন "আত্মশাসন" নীতি লইয়া ভারতবর্ষে অনেক লোকে হাসাইলেন, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রধান নগরীতেই যে তাঁহার সেই নীতির এরূপ শোচনীয় অভিনয় হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আইনমত গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই কলিকাতা মিউনিসিপালিটির উপর এরূপে স্বেচ্ছাচারিত্ব খাটাইতে পারেন না। যদি একথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে, আমরা বলি, আদালতের দ্বারা একবার একটা নিষ্পত্তি করিয়া লইলেই ভাল হইত। আদালতে যদি মিউনিসিপালিটীর কথা না থাকিত, তখন কমিশনরগণ চলিয়া আসিলেই পারিতেন। দেশের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার সঙ্গে বিবাদ এবং অকৌশল করা কোনক্রমেই আমাদের মঙ্গলপ্রদ নহে, কিন্তু সেই শাসনকর্ত্তা যদি আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, এবং আমাদিগকে প্রথমে উচ্চপদবী প্রদান করিয়া অবশেষে সেই পদবীর সমুচিত সম্মান দিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কি করিতে পারি? ছোটলাটবাহাদুর সভায়, অসভায়, পথে, ঘাটে—বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, আত্মশাসননীতির উপর তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি, এবং সেই আত্মশাসন-আইন এখন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে রহিয়াছে; আগামী শীতকালে তাহা জারি করিবেন বলিয়া ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় তিনি সেই নীতির উপর যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন তাহা দেখিয়া আমাদের "শ্লীহা চমকাইয়া" গিয়াছে। কলিকাতা—সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী,—যথায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, উদ্যোগী এবং দেশহিতব্রতী লোকের অভাব নাই—তাহারই যখন এমন অবস্থা, তখন সুদূর মফঃস্বলের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বৃথা লর্ডরিপন আমাদের মনে আত্মশাসন-ক্ষমতার আশা উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন; আমরা এ পর্য্যন্ত সে ক্ষমতার প্রকৃত অর্থ এবং স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

হঃ।

নানাকথা।

"মা গো, গেলাম গো, পেট গেল গো, ওগো আমার সর্ব্বস্বধন গিয়াছে গো"।।।—সতী সাধ্বী স্বর্গে গিয়াছেন, পতিপ্রাণা পাপ পৃথিবী ছাড়িয়া অনন্ত শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আওয়াজ—সেই পাশবহস্ত নিপীড়িতা, বলাৎকার-কুণ্ঠিতা, রক্তরক্তিকৃতবস্ত্রা, হতভাগিনী কুলি কামিনীর সকরুণ আর্ত্তনাদ এখনও ভারতবাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "মা গো, গেলাম গো, পেট গেল গো ওগো আমার সর্ব্বস্বধন গিয়েছে গো"—অহো কি হৃদয়বিদারক কথা! প্রাণের পরতে পরতে যে ঐ কথাগুলি আঘাত করিতেছে। বাতাসের প্রত্যেক হিল্লোলে যে ঐ কথাগুলি 'কুক ছাড়িয়া'। কঁদিতেছে। ভারতবক্ষ আজ বলাৎকারপীড়িতা রমণীর রক্তরক্তে কলঙ্কিত। সতীসাধ্বীর সাংঘাতিক অপমানে ম্রিয়মান। এই কলঙ্ক—এই দুর্ব্বিসহ মহা পাতক-কালিমা ভারতহৃদয় হইতে কে মুছিবে? পিতা পুত্রের রক্তদ্বারা রোম-হৃদয় হইতে এ প্রকৃতির কলঙ্ক একদিন ধৌত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবক্ষ ধুইবে কে? ধিক্ ভারতবাসি! তোমার জীবনে! ধিক্ ইংরাজ, তোমার সাম্রাজ্যে। যে দেশে, যে রাজ্যে পতির বুক হইতে সতীকে ছিঁড়িয়া লইয়া নরকে ফেলিয়া হত্যা করা হইয়াছে,—সে দেশ, সে রাজ্য এখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিল না কেন।।

লোকের প্রত্যাশা, বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের দ্বারা, কতকটা মিটিয়াছে। রাখালবাবুর প্রকাশিত 'প্রচার', অক্ষয়বাবু-সম্পাদিত 'নবজীবন' অপেক্ষা, অনেকের ভাল লাগিয়াছে বলিলে প্রকৃত কথাই প্রকাশ করা হইবে। কিন্তু এরূপ তুলনা সর্ব্বথা নিন্দনীয় (৭)। 'প্রচার' অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ হইলেও, 'নবজীবন' যে নিরাশাপ্রদ, তাহা আমরা এখনই ধরিয়া প্রস্তুত নহি। 'নবজীবনের সম্পাদক নিজে রুচিবান্ ও সুলেখক, রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, অতএব তাঁহার কাগজ উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে না, এরূপ বিবেচনা করাই অন্যায়।

বহু দিনের পর কবিবর হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী কবিতা উপহার দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু কবিতা দুইটী কবিবরের শক্তিশালিনী লেখনীর উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। হেমবাবুর নাম না থাকিলে, কবিতা দুইটী তাঁহার বলিয়া বুঝা বোধ হয় একটু কঠিন হইত।

বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। 'প্রচারে' প্রকাশিত তাহার 'হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রস্তাব-সম্বন্ধে আমাদের এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত প্রস্তাবে বঙ্কিমবাবু যে রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্যক রূপে প্রশস্ত। হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্ম্মের অযৌক্তিক ও অবাস্তবভাবোদ্দীপক কথাগুলি বাদছাদ দিয়া বঙ্কিমবাবু উহাকে খাড়া করিতে চাহেন। উহার অবয়ব ও প্রকৃতি-পদ্ধতি বিরূপ হইবে, অদ্য তাহা ক্রমে বলিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একটী কথা,—ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন যে, বঙ্কিমবাবু যে প্রকার ধর্ম্মের কথা বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মই ত তাই, হিন্দুধর্ম্মের অসার অংশ বাদ দিয়াই ত ব্রাহ্মধর্ম্ম খাড়া কথা হইয়াছে। অতএব বঙ্কিমবাবু যাহা করিবার জন্য অধুনা প্রস্তাব করিয়াছেন, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্ম প্রস্তাবের এক স্থানে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে'। এক্ষণে কথা হইতে পারে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ অর্থে হিন্দু ধর্ম্মের শাখা এবং কি কি লক্ষণের অভাবে ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইতে অসমর্থ? বঙ্কিমবাবু সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। আমরা আশা করি, ভিতরের সকল কথা যথাযথ বিশ্লেষ করিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইবেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মবক্তৃতা-সম্বন্ধে ব্রাহ্মপক্ষ হইতে যে সকল প্রতিবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সারগর্ভ বোধ হইল। আমরা আশা করি, চূড়ামণি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু হিন্দুপক্ষ হইতেও চূড়ামণি মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ হইতেছে। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন,—"চূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা কখনই টিকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না"। বঙ্কিমবাবুর এইরূপ বিশ্বাস। এক্ষণে চূড়ামণিমহাশয় কতদিক সামলাইবেন। তবে তাঁহার সাহায্যার্থে 'কুমার' শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহা একটা আশার কথা বটে। তা ছাড়া 'পনের আনা' কে না কি একজন তাঁহার সহায় আছেন?

আন্দোলন ভাল, যদি তদ্দ্বারা অনুষ্ঠান ও ঐক্য আনীত হয়। ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য বিরল হইলেও ঐক্য ও উদারতা ভিন্ন প্রকৃত ধার্ম্মিকতা সম্ভবে না। আত্মপীড়ন বা পর-রক্তপান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'—ধর্ম্মমাত্রেরই সারসত্তা, বিশেষতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে উচ্চস্থানীয়। হিন্দুধর্ম্ম জীবিতই আছে, অতএব তাহার পুনর্জ্জন্মে আমরা বিশ্বাস করি না। তবে হিন্দুধর্ম্ম বা তাহার অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে যাঁহারা মৃত ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের 'পুনর্জ্জন্ম' অবশ্য সম্ভব। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের সদ্ব্যাখ্যা ও বহুপ্রচার হয় ইহা ত একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ধর্ম্মের আন্দোলন

করিতে যাইয়া বিবাদ বিদ্বেষ আত্মকলহের নূতন অবতারণা করিতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক। এখন হিন্দু মুসলমান-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান—যিনি যাহাই হউন—অন্ততঃ বাঙ্গালী বাঙ্গালীর শত্রুতা করিবার সময় নয়, বন্ধুতা করিবার সময়। এই বন্ধুতাসংস্থাপনপক্ষে যিনি সহায়তা করিবেন, তাঁহারই পুরস্কার, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে ধার্ম্মিক। এস্থলে আর একটী কথা। ধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব। এ সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমরা বড়ই উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। আমরা কোন ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেবল ফাঁকা আওয়াজই আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব। আজকাল ব্যাখ্যাবক্তৃতার ততটা অভাব নাই, যতটা অনুষ্ঠানের অভাব। 'নব্য বঙ্গ' কবে ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইবেন?

জনৈক শূদ্র সহযোগী হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াও তর্কচূড়ামণিমহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে খুব এক হাত লইয়াছেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ-সংঘাতে ব্রাহ্মণের 'ব্রহ্মবজ্রপাত' হইয়াছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সহযোগীর নিরীহ ব্রাহ্মণদিগের উপর এত কোপ কেন? ব্রাহ্মণেরা 'কর্ম্মদোষে' বা 'গ্রহবৈগুণ্যে' পতিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা 'পাকশালায় পয়োনালায়, আদাড়ে, আঁস্তাকুড়ে' এক্ষণে বিরাজ করে, ইহাও সত্য। তবে সহযোগী শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ভক্তশিষ্য হইয়াও, "অথাদ্যং খাদতে" ইত্যাদি বচন বিস্মৃত হইয়াছেন ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, এ সময়ে আর তাঁহারও চাপকান-পাদুকা ফেলিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারে শ্রীচরণের ধূলিদান করিতে হইবে না। অতএব সহযোগী নিশ্চিন্ত থাকুন।

ব্রাহ্মধর্ম্মই হউক আর যে ধর্ম্মই হউক, প্রকৃত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিলে ধর্ম্মপিপাসু অনুষ্ঠানপর হিন্দু দুঃখিত হন না,—ভগবানের নাম যেই করুক, শুনিয়া সুখী হন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মপ্রচারের নাম শুনিয়া ব্রাহ্মসম্প্রদায় ক্ষোভিত হইতেছেন কেন? আর্য্যধর্ম্মের নামে ভ্রান্তিমূলক মত প্রচারিত হয়, উহার বিজ্ঞানের প্রশস্তক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের গৃহবিবাদে আধ্যাত্মিক জগতের যত অনিষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের অনুমোদিত ধর্ম্মকে জড়বাদই বলুন আর পৌত্তলিকতাই বলুন,—তাহার প্রচারে তত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সাকার উপাসনাই হউক আর নিরাকার উপাসনাই হউক, উভয়ই উপাসনা বটে,—কেবল স্থূলসূক্ষ্মভেদমাত্র। আন্তরিকতা থাকিলে সকল ধর্ম্মেই মুক্তির পথ আছে, ইহাও যদি এখনও বাঙ্গালীকে বলিয়া বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে আর তাঁহার 'উচ্চ শিক্ষার' গৌরব কি? পরন্তু উচ্চ শিক্ষার গৌরব যদি 'অজ্ঞেয় বাদ' ও নাস্তিকতা প্রচারই হয় তবে আর 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করিয়া চীৎকার কেন? আইস শুষ্কজ্ঞানের কূটতর্কে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিই!

যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান, আমরা তাহাই চাই; 'ধর্ম্মের কচরচি' চাই না।

'কচকচি' বিস্তর হইয়া গিয়াছে এখন আর তাহাতে সময় নষ্ট করিবার সময় নাই। আর, 'ধর্ম্ম কচকচি করিয়াও কেহ কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে নাই' এই কথাটী একটু সরলে স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলেই ভাল। হয় না কি? হিন্দু মুসলমানবাপ্টিষ্টাদি সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্মের (আচারের নহে) মূলভিত্তিতে দাঁড়াইয়া একত্রিত হওয়া অসম্ভব নাহে। কাযেই আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও আদর্শ ধর্ম্মজীবনের তাহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ —মুনাবিরোধ কি,— তাহা জানে না।

উপরোক্ত কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে অক্ষয়বাবুর 'জাতীয়তা'ঘটিত মত ও ইন্দ্রবাবুর 'মনের কথা' আমাদের মনে পড়িল। ইন্দ্রনাথবাবুর মনে এতও ছিল? বলি, মনের কথা কতটী মনে মনে রাখিয়া ভূলিয়া গেলে কি কিছু বিশেষ হানি হইত? অনেক কথা ভুলা যায় না বটে, কিন্তু চাপা যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের 'মনের কথা শুনিয়া অন্যে যাহা বলে বলুক, আমরা বলি "সই, মনে মনে সেপো মনবেদনা, বোলোনা, বোলোনা, ফুটে বোলোনা' 'মনের কথা' 'খুলে' বলিলে লোকে অনেক সময়ে যাহা বলে, তৎপ্রতি সীমান পঞ্চানন্দ ঠাকুর উপেক্ষা করিলেও প্রকাশ্য বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বোধ হয় করেন না।

একদিকে নলডঙ্গার নবীন রাজা সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাল-বিধবাদিগের হিন্দুমতে পুনর্বিবাহ দিতেছেন; অপরদিকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে খড়্গোত্তোলন করিয়াছেন। কতকগুলি লোক উভয়দিকেই জয় গাইতেছেন। উভয়েরই কার্য্যে —এরের কার্য্য, অপরের কথায়,—বাহবা দিতেছেন। এ রহস্য ভেদ করিবে কে?

সহৃদয় মিরার সম্পাদককে ধন্যবাদ,— তিনি কেরাণীমিরির দুঃখ সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য মিরারের 'মূল্যবান্ স্তম্ভে' অধিকার প্রদান করিয়া ভুক্তভোগিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কেরাণী নিজের দুঃখ বলিবেন না। তিনি জানেন যে, তাহার দুঃখ আবৃত্তিতে নিবৃত্তি হইবে না বরং বৃদ্ধি হইবে। গোপনে গঞ্জনা সহিবেন, তবু নিজের দুঃখ বলিবেন না, —

নিদারুণ, মনাগুণ, হিয়া জ্বলে' যাহে যায়রে,
কহোর পরাণী, কাহিয়ে কেরাণী,
তাই তার প্রাণ দেহে রয়রে।

কেরাণীর দুঃখ, সংক্ষেপতঃ দূর হইবার নহে। দূরদর্শী প্রাজ্ঞ কেরাণী ইহা জানেন, জানিয়া 'চুপ' করিয়া থাকেন, মুখ ফুটেন না। যিনি মুখ ফুটেন, তিনি কেরাণী নহেন, কেরাণীর দুঃখও তত্টা জানেন না।

আমরা "মাস-সমালোচনায়" বলিয়াছি, কলিকাতা মিউনিসিপাল-দ্বন্দ ক্রমে বিলক্ষণ ঘণীভূত হইয়া উঠিয়াছে। পেন, কানিংহাম, টম্‌সন, আরকিডিকন প্রভৃতি যে পক্ষের অধিনায়ক, সে পক্ষের শক্তি সীমামাত্রশূন্য, ইহা বলাই অত্যুক্তি; কিন্তু আক্রমনকারিদিগের শক্তি অসীম হইলেও আক্রান্তপক্ষ বেশ পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া

ছেন। গ্যাস্‌পার-হাবিসনের কটাক্ষ তীব্রতা-ব্যঞ্জক, কৃষ্ণকমিশনরকুলের 'কারিকা' পাঠও সতেজ বটে। এখন দেখা চাই, সাধের 'স্বায়ত্তশাসনের' নিশান উড়ে কি মূলোৎপাটন হয়।

রোগের কারণ নির্ণীত হইলেই ঔষধের ব্যবস্থা হয়। দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবিত হইল। ভারতীয় 'জঙ্গলী' সহযোগীর কোন পত্রপ্রেরক রোগ নির্ণয় করিয়াছেন, আর বঙ্গের জনৈক তান্ত্রিক সহযোগী ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। রোগের যেরূপ কারণ ঔষধের ব্যবস্থা তদনুরূপই হইয়াছে। প্রাগুক্ত পত্রপ্রেরক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের দুরিসহ দুর্ভিক্ষের মূলকারণ 'ছাগল'। ছাগবংশ দিন দিন যদুবংশের ন্যায় বৃদ্ধি হইয়া অরণ্যের অবাস্তর উপাদান শৈশব তরুরাজি ধ্বংস করিতেছে, সুতরাং বরুণদেব বারিবর্ষণ করিতেছেন না। কাযেই মেদিনী শস্যোৎপাদনে বিরতা হইয়াছেন। ফল, দুর্ভিক্ষ হইতেছে। অতঃপর দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধানকল্পে আমাদের তান্ত্রিক সহযোগী উৎফুল্লহৃদয়ে বলিতেছেন, 'তবে অজবংশ, অচিরাৎ ধ্বংস করাই বিধেয়; বিলম্বে দুর্ভিক্ষভার বৃদ্ধি হইতেই থাকিবে'। কিন্তু এই মহদ্বংশধ্বংসের উপায় কি? তন্ত্রবিৎ এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন;—'গবর্ণমেণ্ট নগরে নগরে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, জিলায় জিলায়, থানায়, ফাঁড়িতে—দেশের সর্ব্বত্রে 'কালীবাড়ী' স্থাপন করুন এবং লাটসাহেব হইতে পুলিষ কনষ্টেবল পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মচারিমাত্রেই প্রতিদিন বড়বাজার ব্যাপৃত হওয়ার পূর্ব্বাহ্ণে মহাকালীর আরাধনা করিয়া স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুরূপ 'বলি' প্রদান করুন। ছোটলাটের 'বেলভেডিয়ার' ভবনের অতি নিকটেই কালীঘাট, অতএব তথায় তিনি প্রতিদিন লক্ষ 'পাঁঠা' 'বলি' দিউন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটগণ প্রতিজ্ঞা করুন যে, প্রত্যহ দশহাজার পাঁঠা বলি না দিয়া এজলাসে উপবেশন ও জলগ্রহণ করিবেন না। কিছুদিন এইরূপ হইলে ছাগীবংশপ্রদাম বিধবা হইবে, বিধবা হইলে বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী।' আমাদের বিবেচনায় ইহা সৎপরামর্শ বটে, তবে দেশের হরিসভা ও মালসাভোগী বৈষ্ণব মহাপ্রভুগণ যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না হন।

দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রীর আর আদর নাই। বিলাতি দ্রব্য ভিন্ন আমরা ব্যবহার করি না, সুতরাং দেশীয় শিল্প ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। বিলুপ্ত হইতেছে, তথাচ এখনও যাহা আছে, তাহা কোন অংশে ন্যূন নয় ভূতপূর্ব্ব 'কলিকাতা প্রদর্শনী'ই তাহার প্রমাণ। আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস কোম্পনি কলিকাতা চিৎপুরে 'পেটেণ্ট' চাবি তালার একটী কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের নির্ম্মিত চাবি তালা চব্‌স্ চাবির ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে, অথচ মূল্যও অল্প। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের কার্য্য দেখিয়া সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন ও সরকারী কার্য্যের জন্য দ্রব্যাদিও লইতেছেন। সিন্দুক, বাক্স, ডেস্ক, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতির জন্য নানারূপ চাবি ইঁহাদের নিকট পাওয়া

যায়। দাম কোম্পানির কার্য্যালয় ২৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড, কলিকাতা।

রাজকীয় গ্রন্থাগারের কার্য্যাধ্যক্ষ ১৮৮২ সালের সাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশোপলক্ষে আমাদের মাসিক-পত্র কয়েকখানির একটু সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহার মতে 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব' ও 'ভারতী' প্রথম শ্রেণীর পত্র,—'প্রবাহ' দ্বিতীয় শ্রেণীর। কিন্তু 'আর্য্যদর্শন' কোন্ শ্রেণীর, তাঁহা বলেন নাই। গবর্ণমেণ্টের গ্রন্থাধ্যক্ষমহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালিদিগের ঐতিহাসিক চক্ষু দিন দিন ফুটিতেছে। ইতিহাস লিখিবার শক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে সমাকরূপে বিকসিত না হইলেও, বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যে ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হইতেছে।

ভারত বিদ্বেষী ভূতপূর্ব্ব স্কুলমাষ্টার বোপার লেথব্রীজ সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বারির জন্য উমেদার। হিন্দুপেট্রিয়ট, লেথব্রীজের গুণগান করিয়া তাঁহাকে একেবারে স্বর্গে উঠাইয়াছেন এবং যদ্দ্বারা তিনি পার্লিয়ামেণ্টে আসন প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য আগ্রহাতিশয় দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, লেথব্রীজ-মহাসভায় স্থান পাইলে ভারতবর্ষ যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইবে। পেট্রিয়টমহোদয়ের এই আচরণে আমরা যুগপৎ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। লেথব্রিজের মোহজাল হইতে অনেকেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু দেখিতেছি, হিন্দুপেট্রিয়ট এখনও পারেন নাই।

মিঃ হাবার্ট স্পেন্সারের লিখিত 'ভাবি-দাসত্ব' নামক প্রবন্ধের সারমর্ম্ম ও সমালোচনা আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছি। মে-সংখ্যা কণ্টেম্পোরারী রিভিউতে মিঃ স্পেন্সার 'ব্যবস্থাপকদিগের দুষ্কৃত' (Sins of Legislators) নাম দিয়া আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধটীতে 'ভাবি-দাসত্ব' ঘটিত প্রশ্নেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্পেন্সারের মতে অন্যায় আধিপত্যের উপরেই 'রাজশাসনপ্রণালী' সংগঠিত এবং অন্যায় আধিপত্যেতেই উহার বিস্তৃতি। ব্যবস্থাপকদিগের দুষ্কৃতের অন্যান্য কারণ ছাড়িয়া তাহাদিগের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা জনিত মহাপাতকের বিষয় বর্ত্তমান প্রস্তাবে সমালোচিত হইয়াছে। স্পেন্সার বলেন যে, একজন ঔষধ কম্পাউণ্ডারের অনবধানতা ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত এক ঔষধের স্থলে অন্য ঔষধের সংমিশ্রণে প্রাণিহানি হইলে তাহাকে নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়—তাহার অসদভিপ্রায়বিহীনতা ও জ্ঞানেরঅভাব বা অজ্ঞতা তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু আইনকর্ত্তাদিগের অজ্ঞতানিবন্ধন শতসহস্র প্রাণিহানি হইলেও তাঁহাদের অপরাধ অদৃষ্টব্য,—অবিচার্য্য!!! বস্তুতঃ 'আইন'দ্বারা কি অকার্য্যই না সাধিত হইতেছে? কিন্তু তথাচ আমরা আইনের জন্য লালায়িত!

আমরা ইতিপূর্ব্বে মিঃ সেমুর কি প্রণীত 'ভারত-লুণ্ঠন' বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে সেমুর সাহেবের তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে—'স্থল ও জলের অত্যধিক করের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইয়াছে,—কিরূপে ভারতের ধনধান্য নিয়মিতরূপে অপহৃত হয়। আমরা এই প্রস্তাবের সবিস্তার সমালোচনা বারান্তরে করিব।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; ভাদ্র, দ্বিতীয় পক্ষ। [চতুর্দ্দশ সংখ্যা।

যোগিদিগের আহার ও যোগিচিকিৎসা।

আমরা "যোগরহস্য" নামক প্রবন্ধে কয়েকটী বিষয় বলিবার জন্য পাঠকগণের নিকট প্রতিশ্রুত আছি। তন্মধ্যে যোগিদিগের আহার ও যোগিচিকিৎসা সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কয়েকটী কথা অদ্য বলিব।

যোগাভ্যাসকালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিরূপ আহার করা উচিত, তাহা বলা যাইতেছে।

"মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানারোগোভবেত্তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি॥"

যোগাভ্যাসকালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্রদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। হিত অর্থাৎ সুপথ্য। যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "পথ্যাহার"। যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোন প্রকার গ্লানি জন্মে না, তাদৃশ আহারের নাম "মিতাহার"। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরের ও মনের সত্ত্বগুণ বাড়ে, সেই দ্রব্যই "মেধ্য" অর্থাৎ পবিত্র। এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে "মিতাহার" নিয়মটী সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, এরূপ হইলে কোন একটী সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক। তৎকালে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং কোন্ দ্রব্যই বা বর্জন করিবেক, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা, এই দুই গ্রন্থে লিখিত আছে। যথা,—

"শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা।
মুদ্গযাসঃ কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্॥
পটোলং পনসঞ্চৈব কর্কোলঞ্চ সুকাশকম্।
দ্রাক্ষিকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্॥
আমরম্ভা বালরম্ভা রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম্।
প্রায়োমূলং তথা ঝিঙ্গী যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥
বালশাকং কালশাকং তথা পটোলপত্রকম্।
পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তূকং হিলমোচিকা॥
নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং শুদ্ধং শক্রাদি চৈকমম॥

পক্করম্ভা নারিকেলং দাড়িম্বং বিষমায়সম (?)॥
দ্রাক্ষা তু লবলী ধাত্রী বটুকাম্লবিবর্জিতম।
এলা জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌকলং জম্বু জাম্বুলম (?)॥
হরীতকীং খর্জ্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥"

"ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জিতম।
কর্পূরং বিষ্ঠুরং (?) মিষ্টং সুমঠং সজ্জবস্তুকম (?)।"

"লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যদ্যদ্ধাতুপোষণম।
মনোঽভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥"

শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, শুল্ক ও নিষ্ণস বালকা প্রভৃতি শস্য (?) পটোল, কাঁঠাল, কলোম (?), সুবাশ (?), দ্রাক্ষিকা (?), কর্কটী (কাঁকড় ও ফুটী), রম্ভা, কাঁচকলা, কচিকলা কিম্বা কলার মোচা, ডুমুর, সুকণ্টক (?), ইক্ষুদণ্ড (গোড), মূলক (মূলো), আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙে, কচি কচি শাক, কালশাক, পলতা শাক, বাস্তুশাক (বেতো), হিঞ্চে শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড ও ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, দাড়িম (বেদানা), বিষমায়স বা বিষনাশক (?), কিসমিস্ ও আঙ্গুর, লোনাফল, আমলকী, অম্লবর্জিত অন্যান্য ফল, এলাইচ, জাতিফল, লবঙ্গ, জাম, ফুদে জাম, হরীতকী, পিণ্ডখর্জ্জুর, ক্ষীর (ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ), মিষ্টান্ন, চূর্ণবর্জিত তাম্বূল, কর্পূর, বিষ্ঠুর (?), সুমঠ, জাম্বফল,—এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন। লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতুপোষক ও মনঃপ্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগীদিগের ভক্ষ্য। এরূপ আহারের নাম "পথ্যাহার"। 'দিব্য' শব্দের অর্থ দেবদেয়, সুতরাং দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধেয়।

এক্ষণে মিতাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

"শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধানবর্জিতম্।
ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ॥"
অন্নন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তুরীয়কম্।
উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে॥"

শুদ্ধ অর্থাৎ সুপরিষ্কৃত, মধুরবসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতসিক্ত বা অতীক্ষ্ণ, এরূপ অন্নব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেটফোলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়,—প্রীতিপূর্ব্বক তাদৃশ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি আহার করার নাম "মিতাহার"। মিতাহার ব্রতের অন্য নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা এবং এক ভাগ জল কি দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূরণ করিবেক। অন্য এক ভাগ বায়ুসঞ্চরণের জন্য খালি রাখিবেক। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী ভাল লাগে বলিয়া গণ্ডেপিণ্ডে আহার করিবেন না। নিত্য নিত্য ঐরূপ নিয়মে আহার করার নাম "মিতাহার"। এক্ষণে "মেধ্যাহার" সম্বন্ধে দুই একটী উপদেশ উক্ত হইতেছে।

"মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং সাত্ত্বিকংলঘু।

শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া, এবং লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা "মেধ্যাহার" বলিয়া গণ্য হইবে। এই উপদেশের দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, যোগাভ্যাসকালে মৎস্যমাংসাদি ভক্ষণ, নিষেধ। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জন করা আবশ্যক, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে সংকলিত আছে:—

"অথ বর্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
অম্লং রূক্ষং তথা তীক্ষ্ণং (৮) লবণং সর্ষপং কটু॥
বাহুল্যং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলস্য বিদাহকম্॥
স্তেয়ং হিংসা পরদ্বেষং চাহঙ্কারমনার্জবম্।
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্॥
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্"॥
"কটূম্লং লবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধি তক্রকম্।
শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসং তথা॥
কুশোথং মুসুরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাকদণ্ডকম্।
তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকম্॥
বিল্বং কদম্বজম্বীরং লকুচং লশুনং বিষম্॥
কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেতকম্।
যোগারম্ভে বর্জয়েচ্চ পরস্ত্রীবহ্নিসেবনম্॥
কাঠিন্যং দুরিতঞ্চৈব সূক্ষ্মং পর্য্যুসিতং তথা।
অতিশীতং চাতিচোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জয়েৎ॥
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি-কায়ক্লেশবিধিং তথা।
একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ॥"

যোগিদিগের বর্জনীয় আহার ও ব্যবহার বর্ণন করিতেছি। অম্ল, রূক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটু দ্রব্য পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক ভ্রমণ করা, প্রাতঃস্নান, তৈল মাখা, বিদাহক (ঝাল) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা ব্যবহার, মূঢ়তা, প্রাণিপীড়ন, পরস্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, অনেক কথা (বাচালতা), অত্যাসক্তি ও অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন,—এ সকলই যোগিদিগের অবশ্য ত্যাজ্য। [illegible] উপদেশ আছে। যথা—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভ্রষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্য, দধি, তক্র (ঘোল), ও কঠিন শাক ভক্ষণ কিংবা অধিক পরিমাণে শাক ভোজন, মদ্য, তাল, কাচা কাঁঠাল (ইচোড), কুশোথ (?) মুসুর, পলাণ্ডু, কুষ্মাণ্ডো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্ব (?) (কাঁচা বেল), পদ্মপত্র (?) পাকা বেল, কদম্ব, নেবু, ডেও ফল, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙা, পিয়াল, হিঙ্গু, মণিকেতন (?), পরস্ত্রী, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপকার্য্য, অতি উষ্ণ ও পর্য্যুসিত দ্রব্য, অতি শীতল ও অতি উগ্র অর্থাৎ তীক্ষ্ণ খাদ্য,—যোগী এ সমস্তই বর্জন করিবেন। যোগাভ্যাসকালে যোগী প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস ও অন্যান্য প্রকার কায়ক্লেশ, একাহার ও অত্যল্পাহার করিবেন না।

একাহার অল্পাহার, উপবাস ও লঙ্ঘন প্রভৃতি বর্জন করা ষঠযোগ ও প্রাণায়াম-শিক্ষাকালেরই উপযুক্ত। ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগ অভ্যাসের সময় ঐ সকল অনুষ্ঠানের নিষেধ নাই; বরং বিধিই আছে। যথা—

"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত।
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥

ভীষ্ম উবাচ।

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
ভুঞ্জানোষাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম।
একাহারোবিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
পক্ষান্ মাসান্ ঋতূংশ্চৈব সংবৎ[illegible]
তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥
অশ্বত্থমপীত্বা মাসং সর্ভক্তং মনুজেশ্বর।

উপোষ্য সমক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুযাৎ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণবর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়ান্ তথা॥
অরতিং দুর্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব।
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রীং দুর্জয়াং নৃপসত্তম।
দীপয়ন্তি মহাত্মান সূক্ষ্মাত্মায় নমস্যনা॥"

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ। যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকল্ক ভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য বর্জন করিয়া বল বা যোগশক্তি লাভ করেন। হে শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তাঁহারা যাবক (এক প্রকার ধান্য) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে বলসম্পন্ন (ক্ষমতাপন্ন) হন। শুদ্ধমনে ও একাহারী হইয়া এবং কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসরপরিমিত কাল ও নিত্য নিত্য বা প্রতিদিন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পূর্ণ এক মাস উপবাসী থাকিয়া ও কেহ কেহ বল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, পুরুষভোগ্য বিষয় (রূপরসাদি), অরতি, উদ্যমহীনতা, বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শসুখ, নিদ্রা তন্দ্রা,—এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন এবং আপনা আপনি আপনার আত্মাকে উদ্দী[illegible]ন।

যোগিচিকিৎসা।

যোগাভ্যাসকালে ও তদুত্তরকালে যোগী-দিগের অসাবধানতা-হেতু কখন কখন কঠিন কঠিন রোগ হইয়া থাকে, সে সকল রোগ দুশ্চিকিৎস্য এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের দ্বারা দুরপনেয়, সুতরাং যোগজ উপসর্গ বা যোগব্যতিক্রমজাত রোগ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ তাঁহারা যোগীদিগের উপদিষ্ট পথ আশ্রয় করিতেন। যথাঃ—

"বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতের্মূকত্বমন্ধতা।
অবশ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বদজ্ঞানাদ্যোগিনঃ॥
প্রমাদাৎ যোগিনোদোষা যথৈতে সুস্যুশ্চি-
কিৎসিতাঃ।
তেষাং নাশায় কর্ত্তব্যং যোগিনা যন্নিবোধ
তৎ॥
স্নিগ্ধাং যবাগূমশ্নীয়াৎ ভুক্ত্বা তত্রৈব ধারয়েৎ।
বাতগুল্মপ্রশান্ত্যর্থং মদাবর্ত্তে তথা দধি॥
যবাগূর্বাপি পবনে বায়ুগ্রস্তান্ পরিক্ষিপেৎ।
তদ্বৎ কম্পে মহাশৈলং স্থিরং মনসি
ধারয়েৎ॥
বিঘাতে বচসোবাচং বাধির্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ে।
তত্রৈবাস্ত্রফলং ধ্যায়েত্তৃষ্ণার্ত্তৌরসনেন্দ্রিয়ে॥
যস্মিন্ যস্মিন্ রুগা দেহে তস্মিংস্তদপ-
কারিণীম্।
ধারয়েদ্ধারণামুষ্ণে শীতাং শীতে বিদা-
হিনীম্॥
কীলং শিরসি সংস্থাপ্য কাষ্ঠং কাষ্ঠেন
তাড়য়েৎ।
লুপ্তস্মৃতেঃ স্মৃতিঃ সদ্যোযোগিনস্তেন
জায়তে॥
অমানুষং সত্ত্বমস্তর্যোগিনং প্রবিশেৎ যদি।
বায়ুগ্নিধারণা চৈনং দেহসংস্থং বিনির্দহেৎ॥
এবং সর্ব্বাত্মনা কার্য্যা রক্ষা যোগবিদাং
নিত্যম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং শরীরং সাধনং যতঃ॥

যোগীর অজ্ঞতা বা অসাবধানতাজনিত

বাধির্য্য, জড়তা, স্মৃতিলোপ, মূকতা, অন্ধত্ব এবং জ্বর প্রভৃতি রোগ জন্মে। সে সকল রোগ তাঁহাদের যে প্রকারে চিকিৎসিত হয় এবং উক্ত রোগ নিবারণার্থ তাঁহারা যাহা যাহা করিতেন, সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিতেছি। জ্বর ও দাহ হইলে ঘৃতসিক্ত ছাতু উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবেক, এবং রোগস্থানে ধারণ করিবেক। বাতগুল্ম হইলে তাহার নিবারণার্থ ঐরূপ করিবেক এবং উদাবর্ত্ত রোগ হইলে ঐরূপে দধি প্রযোগ করিবেক। বাক্যলোপ হইলে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধ্যান করিবেক। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে জিহ্বার উপর অম্ল ফল আছে, এরূপ ধ্যান করিবেক। শরীরের যে যে অঙ্গে যে যে রোগ হইবে, সেই সেই অঙ্গে সেই সেই রোগের অপকারী বস্তুর ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ডষ্ণ হইলে শীতের প্রতি চিত্তধারণ, শীতল হইলে উষ্ণের প্রতি মনোধারণ করা কর্ত্তব্য। স্মরণশক্তি লুপ্ত হইলে মস্তকোপরি একটা কাষ্ঠের কীলক রাখিয়া তদুপরি অন্য একখণ্ড কাষ্ঠের আঘাত করিবে। তাহা করিলে শীঘ্রই স্মৃতিশক্তির উদ্রেক হইবে। যোগীর অভ্যন্তরপ্রদেশে বা অন্তঃকরণে যদি কোন অমানুষ জীব (ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি) আবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, বায়ু-ধারণার ও অগ্নিধারণার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে ও অন্যান্যপ্রকারে যোগবিৎ ব্যক্তির সদা সর্ব্বদা শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কেননা, শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রধান উপকরণ।

এই প্রক্রিয়াগুলি মুক্তযোগিদিগের জন্যই বিহিত, পরন্তু যাঁহারা প্রথম যোগী, অশিক্ষিত, কেবলমাত্র যোগাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা এ প্রক্রিয়ায় অধিকারী নহেন। তাঁহাদের কোন রোগ কি কোন উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণার্থ তাঁহাদের হঠযোগোক্ত চিকিৎসার আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। হঠযোগোক্ত চিকিৎসা কিরূপ? তাহা যোগচিন্তামণিগ্রন্থে সঙ্কলিত আছে।

এস্থলে আমরা শ্বাসরোগীকে এক অভিনব ঔষধ বলিয়া দিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। শ্বাস বা হাঁপানি যখন বড় প্রবল হইবে, তখন ভাল করিয়া দেখিবেন, তাঁহার কোন নাসায় বায়ু বহিতেছে। যে নাসায় বায়ু বহিবে, সেই নাক বন্ধ করিয়া অপর নাকে বায়ুর গতি প্রবর্ত্তিত করাইবেন। ১০ মিনিট ঐরূপ প্রণায়াম করিলে হাঁপানি কমিয়া যাইবে এবং প্রতিদিন ঐরূপ করিলে এক মাসের মধ্যেই ঐ রোগ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। যাঁহাদের উদরাময় আছে, তাঁহারা প্রতিদিন নাভিচক্রে মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। দুই সপ্তাহ নাভিকন্দ ধ্যান করিলে করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

হিন্দুধর্ম্ম - মূলধর্ম্ম।

এক্ষণে পৃথিবীতে যে কতিপয় ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইহুদী ধর্ম্মই প্রধান বলিয়া গণনীয়। কিন্তু এই কতিপয় ধর্ম্মের একটু প্রকৃতিগত ভেদাভেদ আছে। খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম আদিধর্ম্ম নহে, অন্য ধর্ম্মহইতে তাহাদিগের উৎপত্তি। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ইহুদীধর্ম্মহইতেই প্রধানতঃ উদ্ভূত হইয়াছে। ইহুদীধর্ম্মের যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ, তাহারই সম্প্রসারণে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে। আবার খৃষ্টীয়ধর্ম্ম মহম্মদীয় ধর্ম্মের জন্মদাতা। তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মস্থ সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে শাখাধর্ম্ম বলিলেও বলা যাইতে পারে। যেমন সুবৃক্ষ হইতে কলম প্রস্তুত হয় এবং সেই কলমে নূতন বৃক্ষ জন্মায়, তদ্রূপ ঐ তিন ধর্ম্মকে কলমের চারা বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহাদের মূলধর্ম্ম ইহুদী এবং হিন্দু। ইহুদী এবং হিন্দু মূলধর্ম্ম হইলেও ইহাদের মধ্যেও একটু প্রকৃতিগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহুদীধর্ম্মের মৌলিকতা নাই;—প্রাচীন মিশরধর্ম্মের সারগর্ভ উপদেশসকল ইহুদীধর্ম্মের ভিত্তিভূমি। ইহুদীজাতির অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ যখন মিশরে বন্দীভাবে অবস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহারা মিশর দেশীয় ধর্ম্মরত্নসকল আহরণ করিয়া নিজ ধর্ম্মমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখেন। মোজেসের দশ ধর্ম্মাজ্ঞা মিশরধর্ম্মের বিয়াল্লিশ ধর্ম্ম দেশের সারসংগ্রহমাত্র। ঈশ্বর ভক্তি, ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, এবং মনুষ্যের প্রতি দয়াদি মিশরধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মাঙ্গসকল ইহুদীধর্ম্মেরও অঙ্গীভূত।* রেভেরণ্ড হোরমহোদয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্টানধর্ম্মের যাহা যাহা প্রধান সম্পত্তি বলিয়া এক্ষণে বিবেচিত হয়, তৎসমুদায় মিশরধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অগ্রে তাহা ইহুদীধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তৎপরে জিসস তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন। সুতরাং ইহুদীধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রাচীন মিশরধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহুদীধর্ম্মের মূল উপদেশসকল মিশর হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহুদীর "প্রফেট"গণ সেই ধর্ম্মের অনেকদূর উন্নতিসাধন করেন। মিশরধর্ম্মের অনেককাল লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাহার অস্থিসকল ইহুদীধর্ম্মের সারত্ব সম্পাদন করিয়াছে। ইহুদীরা সেই অস্থিতে নিম-

* See "Religion of the Ancient Egyptians" in the "Nineteenth Century", December 1878,—by the Rev. John Newenham Hoare.

ধর্ম্মের গঠন ও অঙ্গসমুদায় সৃষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আর সে ধর্ম্মকে কিছুই চিনিতে পারা যায় না। একটি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম এরূপ নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যসন্তানগণ ভারতমধ্যে আবদ্ধ আছেন। তাঁহারা বহির্দ্দেশের সহিত সকল সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাসমুদ্র ভারতকে বেষ্টন করিয়া অন্যদেশ হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। অলঙ্ঘ্য হিমালয় ও সিন্ধুনদ তাহার দুই দিকের পরিসীমা। সে সীমা প্রাচীন আর্য্যগণ কখন অতিক্রম করেন নাই। উহার বহির্দ্দেশে সকলই ম্লেচ্ছভূমি ও যবনাধিকার,—আর্য্যগণের অস্পৃশ্য। ভারতমধ্যে আর্য্যগণ এইরূপে আবদ্ধ হইয়া আপনাদের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতেন। ভারতের উর্ব্বরতা তাহাকে ধনধান্যে পূর্ণ করিয়াছিল; তাহার খনিজধন তাহাকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার সাগরগর্ভস্থ মুক্তাসকল তাহাকে শোভিত করিয়াছিল। ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে সুতরাং আর্য্যগণের কখন প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহাদের সমস্ত অভাব ভারতই সম্পূরণ করিয়াছিল। আমরা ভারতের বহির্বাণিজ্যের কথা যাহা শুনিতে পাই, তাহা সেদিনকার কথা। প্রাচীন আর্য্যগণ বহির্দ্দেশের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। তাঁহারা কেবল নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহজন্য ভারতমধ্যেই বিচরণ করিতেন। এই জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা যে সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই আর্য্যজাতির বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন পুরাণ; তাহাই তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যা, কলা ও শাস্ত্র। তাঁহারা অন্যদেশীয় কোন বিদ্যা জানিতেন না, অন্যদেশীয় কিছুই তাহারা গ্রহণ করিতেন না। আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি যাহা দিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট ও প্রচুর। আর্য্যধর্ম্ম এইরূপ নিরপেক্ষভাবে অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে স্ফুরিত এবং বিস্তারিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ নিজে নিজেই সেই বৃহৎ বিদ্যাকে ও জ্ঞানভাণ্ডারকে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। জ্ঞানের জন্য তাঁহারা কোন দেশের নিকট ঋণবদ্ধ নহেন। হিন্দুধর্ম্ম ও আর্য্যবিদ্যা এইরূপে আপনা-আপনি অতি প্রাচীনকালাবধি সমুন্নত এবং স্ফুরিত হইয়া আসিয়াছে। আজি তাহা অসংখ্যশাখাসম্পন্ন হইয়া বৃহৎ মহীরুহরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এত কালের প্রাচীন ধর্ম্ম ও বিদ্যা আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। মিশরধর্ম্ম ও মিশরবিদ্যা অতি প্রাচীন ছিল, কিন্তু তাহা একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে প্রাচীন যত ধর্ম্ম ছিল, সকলই গিয়াছে। প্রাচীন আরব, পারশ্য, ব্যাবিলন, মিড, তুরস্ক প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে এখন মুসলমানধর্ম্ম স্থাপিত। শ্যাম, ব্রহ্ম, প্রাচীন চীন প্রভৃতি দেশ এখন বৌদ্ধাধিকার। মিশরে এখন মুসলমানধর্ম্ম। প্রাচীন গ্রীক, রোমীয় কেল্ট এবং টিউটনিক ধর্ম্মসকল খৃষ্টানধর্ম্মের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। আমেরিকায় এখন খৃষ্টানধর্ম্ম। প্রাচীন সেমেটিকজাতি এখন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৌদ্ধাদি শাখাধর্ম্মসকল এক্ষণে পৃথিবীতে প্রভূত প্রভাবশালিনী হইয়া মহাপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। কাহারই কিছু চিহ্ন নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্রাজে এই ধর্ম্মত্রয়ই দেদীপ্যমান। যে

হিন্দু ও ইহুদীধর্ম্ম হইতে ইহারা উৎপন্ন, তাহাদিগের প্রভুত্ব ততদূর নহে। কিন্তু ইহাদিগের প্রভুত্ব আজি সর্ব্বদেশেই স্থাপিত।

মূলধর্ম্ম যাহা, তাহা স্থির থাকে। যাহা মূলধর্ম্ম নয়,—শাখাধর্ম্মমাত্র, তাহা মূলধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন হইবার জন্য আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যায়। যাহাকে (ইংরাজীতে Proselytism) ধর্ম্মপ্রচার বলে, তাহা মূলধর্ম্মে নাই। তাহা কেবল শাখাধর্ম্মের গুণ। শাখাধর্ম্মসকল স্বপ্রধান ও স্বাধীন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবার জন্য অন্যদেশে বিস্তারিত হইতে যায়, প্রাচীন মূলধর্ম্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে চাহে। সেই মূলধর্ম্ম হইতে যেন কি নূতন সত্য ও মহার্হরত্ন লাভ করিয়াছে, সেই সত্য ও মহার্হরত্ন জগন্ময় দান করিতে যায়। শাখাধর্ম্ম সকল এইরূপ স্বপ্রধানত্ব স্থাপনজন্য অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বিগণকে আপন আশ্রয়ে আহ্বান করে। কোনরূপে উপাসকসংখ্যার বৃদ্ধি করিতে পারিলেই গণনীয় হইবে বলিয়া সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। মুসলমানধর্ম্ম একহস্তে তরবারি অন্যহস্তে অগ্নি লইয়া পৃথ্বীময় প্রচারিত হইয়াছে। অনেক স্থলে অনেক অসৎ উপায়ে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের পতাকা রোপিত হইয়াছে। এই শাখাধর্ম্মসকল নিজ নিজ প্রচারকার্য্যকালীন নানাবিধ ধর্ম্মপ্রণালীর সহিত বিরোধে আইসে, সুতরাং তাহাদের উপাসকদল জানিতে পারে, পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত আছে। তাহারা আপনাদের সহিত অন্যদের পৃথকত্ব বিশিষ্টরূপে অনুভব করিতে পারে। যে ধর্ম্ম তাহারা প্রচার করিতে উদ্যত, তাহা যে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, তাহা তাহারা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারে। খৃষ্টান, মুসলমান এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপাসকগণের এই পৃথকত্বজ্ঞান বিলক্ষণ।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের উপাসকগণের এই জ্ঞান ছিল কি না, বলা যায় না। হিন্দুধর্ম্ম কেবল ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই আর্য্যগণ যাহা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন তাহাই তাহাদের ধর্ম্মমধ্যে নিবিষ্ট হইত। তাঁহারা কখন অন্য ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন উপাসকসম্প্রদায় বাহির হইত তাঁহারা সে হিন্দুধর্ম্মেরই এক এক মতাবলম্বী বলিয়াই গণ্য হইতেন। তাঁহারাও হিন্দু ছিলেন,—কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, কেহ গাণপত্য,—এইরূপপ্রকার প্রভেদমাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মকেও হিন্দুরা প্রথমে এই প্রকার সম্প্রদায়বিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম আপনা আপনিই প্রবুদ্ধ হইয়া নানা শাখাবিশাখায় বিস্তারিত হইতেছে। অন্যের সহিত তাহার সংস্রব নাই। যবনাচার এবং ম্লেচ্ছাচারসকল তাহার অশ্রদ্ধেয় ছিল। আপনার শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে পূরিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম অন্য সকলপ্রকার আচারব্যবহারের প্রতি ঘৃণা করিত;—ভারতমধ্যে নিরপেক্ষভাবে, সর্ব্বদেশের প্রতি অন্ধ হইয়া, নিজ উন্নতিসাধনেই ব্যস্ত ছিল। কিসে আপনাদের উন্নতি হয়, আপনাদের সুখবৃদ্ধি হয়,—হিন্দুগণ তজ্জন্য ভারতমধ্যেই নানা বিদ্যার ও নানা শিল্পের অনুশীলন করিয়াছিলেন। এক সুখ এবং উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সর্ব্ববিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ইহলোক এবং

উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সর্ব্ববিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। ইহলোক এবং পরলোকের সুবিধানজন্য কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতেন এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত, তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। লক্ষ্য যখন এক ছিল, তখন উপায়সকল বিভিন্ন হইলেও সকলই এক লক্ষ্যের উপায় বলিয়া গণনীয় হইত। সুতরাং, এই লক্ষ্যসাধনপক্ষে যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত, হিন্দুগণ তাহাকেই 'ধর্ম্ম'নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহারা প্রথমে ইহাদের ভেদাভেদ জানিতেন না। জ্ঞানের উন্নতি অনুসারে যখন তাঁহাদের মধ্যে তুলনাবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত হইল, যখন তদ্দ্বারা তাঁহারা উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রভেদ করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা কতকগুলি উপায়কে উৎকৃষ্ট এবং অন্যদিগকে অপকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিলেন মাত্র। নহিলে সকলই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, সবলই কর্ত্তব্য, সকলই সুখের উপায়। এই জন্য, বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "আর্য্যদিগের চিত্তে সমগ্র মানবজীবন হইতে বিলিজন (Religion) কখন পৃথগ্‌ভূত হয় নাই।" ইংরাজিতে "বিলিজন" শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই।" হিন্দুধর্ম্ম বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা একটি সামগ্রীমাত্র, তাহা হিন্দুগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অনুষ্ঠানমাত্র। তাহা হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা, তাহা হিন্দুবিজ্ঞান ও শিক্ষা, তাহা হিন্দুর জ্ঞান ও অনুষ্ঠান;—এক কথায়, তাহা হিন্দুর শাস্ত্র অথবা বিদ্যা। যাহাকে নীতি বলে, যাহাকে বিলিজন বলে, যাহাকে পুণ্য বলে, এ সমস্তই হিন্দুধর্ম্ম। যাহাতে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, যাহাতে রিপুগণের শাসন হয়, যাহাতে স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তিসকলের উদ্রেক ও অনুশীলন হয়, যদ্দ্বারা আপনার এবং সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম হওয়া যায়, এবং যাহাতে শরীরেরও বলাধান হয়,—এ সকলই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুশাস্ত্রে এ সমস্তেরই বিধান আছে। ইহার বিপরীতাচার হিন্দুগণের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া গণনীয় ছিল। হিন্দুধর্ম্মের—এই হিন্দুধর্ম্মের অর্থ—কর্ত্তব্য,—শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য—আপনার এবং অপরের প্রতি কর্ত্তব্য,—আত্ম, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পারলৌকিক কর্ত্তব্য। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র এত প্রকাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। সেই শাস্ত্রমাত্রে শারীরিকবিধানসকলও উক্ত হইয়াছে, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবহারসকলও আলোচিত হইয়াছে। এক শাস্ত্রমধ্যে একত্রে সকলেরই সমাবেশ আছে। হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুসভ্যতা, হিন্দুবিদ্যা, এবং হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ সমস্তই হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা উদ্বোধিত, বর্দ্ধিত, সমুন্নত এবং পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুবিদ্যা, হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসভ্যতা—নামান্তরমাত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের তাৎপর্য্য একই; তাহাদিগের তাৎপর্য্য—হিন্দুজাতির কর্ত্তব্যনিরূপণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

বঙ্গীয় প্রাচীন কবি ও কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যথার্থ কবির রাজ্য পৃথিবী হইতে দূর-দূরান্তরে অবস্থিত। তিনি মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। কোন্ রসের সঞ্চারণজনিত হৃদয় উৎফুল্ল হইল—কোন্ ভাবের আবির্ভাবজনিত হৃদয়ে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইল, তাহাই কেবল দেখিতে থাকেন। তাঁহার দর্শনের মধ্যে মিথ্যা আসিতে পারে না, তিনি যাহা দেখেন, তাহা নিত্য, সত্য,—সে সত্য পরিবর্ত্তিত হয় না। চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, অনন্ত আকাশ বল, আর অতলস্পর্শী মনুষ্যের অন্তঃকরণই বল,—কবি যে ভাবে এ সকল অবলোকন করিবেন, অন্যে তাহা বুঝিবে না,—অন্যের সেইরূপ দেখিবার ক্ষমতাও নাই। জগৎ অন্ধ, যতক্ষণ তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া কবি তাহাকে সৌন্দর্য্য না দেখাইয়া দেন, ততক্ষণ তাহার দেখিবার শক্তি জন্মে না। কবি সৌন্দর্য্যের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেমন করিয়া যে, মধুরিমা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহাই দেখাইতেছেন,—

"The awful shadow of some unseen Power
Floats though unseen, among as , visiting
This various world with as inconstant wing
As summer winds that creep from flower to flower
Like moonbeams that behind some piny mountain shower.
It visits with inconstant glance
Each human heart and countenance ,
Like hues and harmonies of evening,
Like cloud in star-light widely spread,
Like memory of music fled,
Like aught that for its grace may be
Dear, and yet dearer for its mystery."

তোমার-আমার নিকট যাহা তুচ্ছ, যেখানে তুমি-আমি কোন মনোহারিতা দেখিতে পাই না, কবি সেখানে বংশীধ্বনি শুনিতে পান—মলয়মারুতের বিশ্বহিল্লোল

দেখিতে পান, তাঁহার কল্পনা তাঁহাকে নয়নের অতীত পদার্থ দেখায়—সেই দৃশ্য তিনি আজীবন মজিয়া রহেন—পৃথিবীর অশান্তির মধ্যে থাকিয়া তিনি সেইখানে অনন্তশান্তিরাজ্য স্থাপন করেন।

"The meanest flower of the vale,
The simplest note that swells the gale
The common sun, the air, the skies,
To him are opening paradise

কতকগুলি কাব্যের লোকের শিরস্থান ধারী প্রাণী আছেন, তাহারা কবিতার উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের বিশ্বাস, কবিতা সভ্যজগতের চক্ষার বস্তু নহে, উহা অসভ্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং অসভ্য অবস্থারই অনুশীলনীয়। এই প্রকার রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কবিতার প্রয়োজনীয়তা না বুঝাইয়া, বরঞ্চ কৌশলে টাকশালে পাঠাইয়া দিলে, রৌপ্যের দর্শনে ও স্পর্শনে তাহাদিগের মন (যাহা প্রায় ধাতুরূপে পরিণত হইয়াছে) ক্রমে রৌপ্যত্বে পরিণত হইতে পারে।

মহাত্মা বার্ক্‌কে অনেকে কবিতাদ্বেষী বলিয়া থাকেন, কিন্তু সে কথা আমরা বলি না। বার্ক হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি কবিতা যে কি বস্তু, তাহা কখনই বুঝিতে পারিবেন না। বার্ক বলেন,—

"The study of Poetry is the study of human nature, and, as this is the first object of philosophy Poetry will always rank first amongst human compositions"

প্রাচীন গীতি-কবিতা-লেখকদিগের মধ্যে চণ্ডিদাসের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। চণ্ডিদাস নিজের রাজ্যে বসিয়া গান গাহিতেন। এ গান প্রেমের গান। প্রেমিক হইতে হইলে যে যে সাধনার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা চণ্ডিদাস যেমন বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি তেমন বুঝেন নাই, গোবিন্দদাস তেমন বুঝেন নাই এবং রামমোহন ও ভারতচন্দ্রের সে বুঝিবার শক্তিও হয় নাই।

"পিরীতি পিরীতি' সবজন কহে,
পিরীতি সহজ কথা,
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিলা যে!
পিরীতি রতন লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া, আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক-অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি-আশ।"

প্রেমের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! আর একটি বিশুদ্ধ প্রেমের দৃষ্টান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত

করিতে বাধ্য হইতেছি, এই কবিতাটির সহিত চণ্ডিদাসের হৃদয়ের অভেদ সম্বন্ধ আছে।

"শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ও ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনীরূপ, কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিরমল হেম
বড়ু চণ্ডিদাসে গায়।"

কবিতাটির মধ্যে প্রেমের কথা রহিয়াছে, কিন্তু 'কামগন্ধ' নাই। কামগন্ধকে দূরে রাখিয়া যে পিরীতি করিতে হয়, তাহা কেবল চণ্ডিদাসই বুঝিয়াছিলেন, অন্য বৈষ্ণবকবি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

"কাঞ্চন কমল পরশে উলটাপাল,
ঐছন বদন সঞ্চারি,
সরবস নেই পালটি পুন বিন্দল,
রঙ্গিনী রঙ্গ নেহারি।
সজনি, কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আধ নাহি মিটল,
পালটি না হেরনু রাধা।
ঘন ঘন অঁটর কুচ কল কাচর,
হাসি হাসি পুনু তহি হেরি,
জনু মঝু মন হরি কনয়া শম্ভু ভরি
মোহরি রাখল কত বেরি!
যব মন বাঁধল, ইন্দ্রিয় ফাঁফর,
তাঁহে মিলল আন আন।
কাঠক মূরতি জৈছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।"

বিদ্যাপতির উপরিলিখিত কবিতাটিতে ভাষার গাঢ়ত্ব আছে—পার্থিব ঠেশাঠেশি মেশামেশি গোছের ভাব আছে—পদমধ্যগত শালিতা আছে, কিন্তু চণ্ডিদাসের মত পৃথিবীছাড়া মাধুর্য্য নাই। বিদ্যাপতি আসক্ত পুরুষের নিকট আদৃত, চণ্ডিদাস উদাস পুরুষের নিকট মান্য। চণ্ডিদাসের কবিতা যে কবিত্বে পূর্ণ, তাহাই দেখাইতেছি —

"কাহে——
সে ধনী কে কহ বটে।
গোরী সে নাগরী, নবীন কিশোরী
নাইতে দেখিনু ঘাটে।
অঙ্গের বসন করিয়ে আসন
বসিছে আপন গা,
বাশিন্দার তীরে, বসে তার নীরে
পায়ের উপর পা।
কিবা সে ত্রিবলি, শঙ্খ ঝলমলি।—
শরু শরু শশিকলা
মাজিয়া উদয় যেন সুধাময়,
দেখিয়া হইনু ভোলা।
নাহিয়া উঠিত, নিতম্ব তটেতে
পড়েছে চিকুররাশি,—
কাঁদিয়া আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লয়েছে আসি।
চলে নীলশাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর,
দেখিয়া অন্তর উপজিল জর
মনমথ শরে ভোর!
বাসলী-আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
শুনহে নাগর-চাঁদা,
সেই বৃষভাণু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা।"

এইরূপ কবিতা ভাষার অলঙ্কারশূন্য

যতদিন ভাষা থাকিবে, ততদিন এরূপ কবিতাও থাকিবে। এই কবিতার কখনই মৃত্যু হইবে না।

অদ্বৈতমঙ্গল-প্রণেতা কবি হরিচরণ আচার্য্যের কবিতার মধ্যেও সুন্দর সুন্দর ভাব আছে। যথা—

"মরণে ঘিরেছে তার সমস্ত জীবন,
তেঁই সে প্রভুরে করে মন্দ-আচরণ।
আপনি নরক সৃজি ডুবিছে তাহায়,
মৃত্যু পরে পরে সে গো ডুবিয়া ঘুমায়।
পাপীরে স্মরণে হয়, দয়ার সঞ্চার,—
দয়াময় মোর প্রভু, ভাবনা কি তার?"

অদ্বৈতপ্রভুর উপর যখন শিলেটের রাজা অত্যাচার করেন, তখন সেই রাজাকে অবলম্বন করিয়া কবি কাব্যমধ্যে ঐ ভাবটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"দয়াময় মোর প্রভু, ভাবনা কি তার?"

এই ছত্রটির মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা, সহৃদয় পাঠক, আপনিই বুঝিতে পারিবেন।

মহাকাব্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন এক একজন কবির লেখাকে এক এক সর্গ বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের সকল কবির কাব্যকে ডজোয়ান মনে করিলে, মাইকেলকে প্রথম সর্গ বলিতে পারা যায়। হেম ও নবীন তৃতীয় সর্গ আর রবীন্দ্রনাথই কেবল দ্বিতীয় সর্গের যোগ্য। বাস্তবিক আমরা বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্য সমালোচনা করিব। গীতিকবিতা—বাঙ্গালার বৈষ্ণবকবিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ন্যায় অমৃতময়ী কবিতা অন্য ভাষায় নাই। চণ্ডিদাসের কবিতার সহিত Shelley কিম্বা Wordsworth-এর কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অধুনাতন কবিদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার কবিতার সহিত (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা-ব্যতীত) কোন ভাল ইংরাজ কবির কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে। কোন সমালোচক বলেন, "Poetry is relished only by a few" এ কথাটি বড় যথার্থ কথা। মনুষ্যের অন্তঃকরণমধ্যে নানাপ্রকার সদ্‌গুণ নিহিত থাকুক, যদি সে অন্তঃকরণ কবিতাময় না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্যদর্শনের শক্তি জন্মে না। ছন্দোগুম্ফিত বাক্য হইলেই যে কবিতা হইবে, একথা আমরা বলিনা। সহস্র পঙক্তি ছন্দোময় বাক্যের মধ্যে, দুই চারি ছত্র যথার্থ কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা Richardson ও এই কথা বলেন—

"Persons of talents or learning without genius, with all their labor and assiduity, produce nothing in verse worthy of preservation and are never poetical even by accident. In five thousands of their verses there are not five lines of poetry. When we meet with the shortest fragment of true poetry, we allow the praise of genius to the writer"

যথার্থ কবিতা প্রাণের মধ্যে স্বর্গের উৎপত্তি সাধন করিয়া থাকে। যাহা প্রকৃত কবিতা, তাহা গদ্যই হৌক, আর পদ্যই হৌক,—যাহাতেই প্রকাশ কর না কেন, তাহা হইতে কবিতার সুমধুর ধ্বনি আপনিই বাহির হইবে। কালিদাসের মেঘদূত অথবা শকুন্তলা পাঠ করিতে করিতে হৃদয় ভাবস্রোতে ভাসিতে, ভাসিতে কবি-

তার বাক্যে গমন করে। সেখানে সংগীত ছাড়া শব্দ নাই, ইন্দ্রধনু ছাড়া বর্ণ নাই, মন্দার-সুরভি ছাড়া গন্ধ নাই,—সেখানে যাহা স্বর্গীয়, তাহাই পরিদৃশ্যমান।

আমরা প্রাচীন কবি ও কাব্যের সমালোচনা করিতে বসিয়া অনেক কবির কথা উল্লেখ করিলাম না। বসন্তরায় ও কবিকঙ্কণ উভয়েই উচ্চদরের কবি। ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন বহুকাল ধরিয়া 'কবি' নামে খ্যাত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইঁহাদিগের কাব্যমধ্যে প্রচুরপরিমাণে নীচ রসিকতা আছে, যথার্থ কবিতা নাই বলিলেও চলে।(১)

বঙ্গভাষার কৈশোরকালে যে সকল প্রাথমিক বঙ্গীয় কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যে, কোন কাব্যবিশেষ রচনা করিয়া আপনাদিগের অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, তবে কেহ একটি, কেহ বা দুইটি কবিতা রচনা করিয়া, কাব্যরচনা কেমন করিয়া করিতে হয় তাহা বই জটিল পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। বঙ্গভাষার পৌগণ্ড কালে ও কৈশোর কালের সন্ধিস্থলে যে সকল ক্ষুদ্র কবিতা রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরম্পরা প্রচলিত একটি কবিতা এইস্থলে তুলিয়া দিলাম। এই কবিতার তাৎপর্য্য কি, এবং কি অভিপ্রায়ে কবির মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মগ্রহণে আমরা সমর্থ না হইলেও, উহার কোন তাৎপর্য্য নাই, একথা বলা অপেক্ষা, উহার ভাবপ্রকাশের নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসু হওয়া কর্ত্তব্য।

কবিতা যথা,—

"কলাপাতি কলাপাতি নাগরী,
তার বউটী—সাগরী,
মারিলে ঠোকনের ঘা,
গলার কাঁটা উলে যা।
গলার কাঁটায় আলি ডাল,
তাতে আছে গোপুরাল,
গোপুরালের বাদ্য বাজে,
তাহা শুনে হাসা ডাকে।
আসবে হাসা চরসি,
জোড়া বেগুণ খরসে।
যে দিবে মুঠো মুঠো,
তার হবে আদুল টুঁটো;
যে দিবে কুলো কুলো,
তার হবে বুকশূলো,
যে দেবে নাদা নাদা,
তার দুয়ারে হাতি বাঁধা,
যে দিবে মালা মালা,
তার ঘরে কভীর ছালা।
ভিক্ষা মাগি পোরমাসে
কহে বিদ্যাবাম দাসে।"

এই কবিতাটির রচনাপ্রণালী দেখিয়া ইহাকে খুব প্রাচীনকালের রচনা বলিয়া প্রতীত জন্মে। বিদ্যারামকে বাঙ্গালার আদিকবি বলিয়া বোধ হয়।

বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্য সমালোচনের সময়ে আমরা জ্ঞানদাস প্রভৃতির উল্লেখ করিব।(১)

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

(১)। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে কবিত্ব নাই, ইহা আমরা স্বীকার করি না। প্রত্যুত 'বঙ্গসাহিত্য প্রণেতা দত্তজমহাশয়ের সহিত বলি, "Ramprasad was a true poet, every inch of him."

পাঃ সঃ সঃ।

(১)। এই প্রবন্ধলেখকের কোন কোন কথার সহিত আমাদের মতের ভিন্নতা আছে।

পাঃ সঃ সঃ।

শারদীয় উৎসব ;—নিশীথ-চিন্তা।

শারদ-আকাশে সুন্দর নক্ষত্র
ফুটেছে, রজনি, আবার আজ,
দেখিতে দেখিতে পুনঃ সম্বৎসর
সময়ের চক্রে ঘুরিয়া গেল।

সময়ের চক্রে ঘুরিয়া আবার
আসিল সুখদ শরত ওই,
হাসিছে চন্দ্রিকা, ফুটেছে কুমুদ ;—
কিন্তু, সখি, সেই সন্তোষ কই ?

আসিল শরত—শারদীয় পূজা
আবার এ বঙ্গে বরষ পরে,
আবার বাজিল মধুর বাজনা,
আবার উৎসব ঘরে ঘরে ঘরে।

আবার আনন্দে, উৎসবে, উৎসাহে,
নাচিল হৃদয়, মাতিল মন,
নবীন উদ্যমে ডুবিল আবার
মহোৎসবে ওই বঙ্গবাসিগণ।

বাজিল আবার প্রিয় বঙ্গব্যাপী
মঙ্গল বাজনা—মধুর বাঁশী,
গৃহে গৃহে গৃহে নবীন বসন
উৎসব, উল্লাস, মধুর হাসি।

সম্বৎসর পরে হেরি মহামায়া,
ভক্তি-বিগলিত বঙ্গের মন ;
"দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দুর্গা দুর্গা"
উচ্চৈঃস্বরে ভক্ত করে উচ্চারণ।

হৃদয় চিরিয়া লয়ে রক্তকণা
চারু বিল্ব-পত্র রঞ্জিত ক'রে,
লিখিতেছে ভক্ত 'লক্ষ দুর্গা নাম'
মুক্তি-প্রাপ্তির তরে।

গলে লগ্ন দিব্য বঙ্কিম বসন
করি 'আচমন' প্রফুল্লমনে,
কৃতাঞ্জলিপুটে, আহা, ভক্ত ওই
ধূলিবিলুণ্ঠিত কাতর প্রাণে।

গম্ভীর, প্রফুল্ল, মুখশ্রী সুন্দর,—
ভক্তিপ্রেম যেন ক্ষরিছে তায়,—
করে গন্ধপুষ্প, প্রেমাশ্রু নয়নে,
দিতেছে অঞ্জলি দেবীর পায়।

পৌত্তলিক বটে যদিচ ইহারা
নাহিক বিশুদ্ধ মার্জ্জিত জ্ঞান,
পূজিবারে নিত্য স্বীয় ইষ্টদেবে,
নহে সঙ্কুচিত ত্যজিতে(ও) প্রাণ !

* * * *

ধান্য-দুর্ব্বা-গন্ধ-কুঙ্কুম কস্তূরী,
মঙ্গল-নিদান বরণ-ডালা
দিয়াছে সাজায়ে দেবীর সম্মুখে
কতই আদরে বঙ্গের বালা !

সুবদনে শঙ্খ করিয়া চুম্বন,
সজোরে সুন্দরী বাজায়ে (ওই
শুনলো, রজনি, সুমঙ্গলধ্বনি)
অর্চ্চিছে আনন্দে আনন্দময়ী।

* * * *

শক্তি-সৌন্দর্য্যের অতুল সমষ্টি,—
অতুল সমতা,—প্রতিমাখানি ;—
হেন ইষ্টদেবী—কোথা পেলে বঙ্গ ?—
কোথা পেলে বঙ্গ—দুর্ব্বলপাণী !

দশভুজা-মূর্ত্তি—আনন্দ-প্রতিমা—
বিরাজিত আজ ভক্তের ঘরে ;

ভক্তি স্নেহ-প্রেম দান-সৌজন্যতা,
সংমিলিত, আহা, বৎসর পরে।

মরি কি আনন্দ। মরি কি উল্লাস।—
মরি মরি, আজ এ বঙ্গমাঝে।
হায়রে, অজ্ঞানবঙ্গের সন্তান
সুসজ্জিত কিবা সুন্দর সাজে!

তব আগমনে আজ কি, গো দুর্গে।
প্রফুল্লিত ম্লান-বঙ্গের মুখ?
তব আগমনে ঘুচিবে কি, ওমা,
এবার বঙ্গের সুচির দুখ?

কত ভাবযাগে বাঁধা যে গো প্রাণ
তোমার ও রাঙা চরণ সনে,
শুনিলে, জননি, তব আগমন,
সব পূর্ব্বকথা পড়ে গো মনে!

হায় পূর্ব্বকথা। শৈশব ঘটনা,
তরুণ উৎসাহ,—কতই সব
জাগিয়া হৃদয়ে, ওমা, পুনরায়
করে অভিভূত সন্তানে তব।

সেই স্নেহময় সুখের সদন,
সেই স্নেহময়ী জননী-চরণ,
জনকের সেই প্রশান্ত বদন,—
যুগপৎ, ওমা, পড়িল মনে।
সেই প্রাণাধিক ভ্রাতাভগ্নিগণ,
সেই সুধামাখা প্রিয়সম্ভাষণ,
সেই পুরাতন 'নূতন বসন,'—
কোথায় সে সব! হায় এক্ষণে।
স্মৃতিমাত্র আছে, কিছুই তা' নাই,—
পুড়ে' গেছে সুখ, পড়ে আছে ছাই!
কঠিন পরাণ বেঁচে আছি তাই,
বুঝিতেছি আজ(ও) অদৃষ্টসনে!

কেন, মা, জাগালি সেসব কাহিনী?—
সেই দুঃখমাখা সুখের-কাহিনী?—
সহস্র সহস্র যাহার ঘটনা,
সহস্র যাহার বিঘ্নবিড়ম্বনা,
সহস্রঃ যাহার সুখের উল্লাস,
সহস্রঃ যাহার স্নেহের উচ্ছ্বাস,—
কেন সে কাহিনী আজি, মা, জাগায়ে,
উথলিয়া দিলে সন্তানের হিয়ে?
অতীত—বিগত—আহত সে দিন,
সময়ের গর্ভে হয়েছে, মা, লীন,
এক দুই করে কত সম্বৎসর,
হইল বিগত, ওমা, তার পর,
এলে, গেলে তুমি, হায়, কতবার
এই বঙ্গভূমে ভ্রমন করে।
এলে, গেলে, ওমা, আসিবে আবার,—
হাসিবে কি, ওমা, এ হৃদয় আর?—
আসিবে কি ফিরে আর পুনর্ব্বার,
গিয়াছে যে সব—ক্ষণের(ও) তরে?

* * * * *

প্রিয় বঙ্গভূমি, হাসিছ আনন্দে?—
হাস হাস, আহা! ভালবাসি আমি,
দেখিতে তোমার সহাস্যবদন।
দেখিয়া তোমায় আনন্দে মগণ,
হয়রে বিদগ্ধ হৃদয়ে আবার,
অলক্ষ্যে ঈষদ্ উদ্যম-সঞ্চার,
ক্ষণেকে কিঞ্চিত মনের বিকার,
ঘুচে,—হৃদয়ের আঁধাররাশি॥
যদি কোন সুখ থাকেরে এক্ষণে,
এই অভিশপ্ত সন্তপ্ত জীবনে,—
সে কেবল, আহা, তোমার উল্লাস,
তোমার প্রকৃত বিমল বিলাস,
তোমার উৎসাহ, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
তোমার হৃদয় নিঃসৃত হাসি।
কিন্তু উচ্চ-হাসি এত গো তোমার,

নহেক প্রকৃত ,—বিকৃত ব্যাপার,
হয় না ইহাতে আশার সঞ্চার,
হৃদয় কেবল(ই) বিদগ্ধ করে।
হাসিতেছ'—কিন্তু এ উচ্চ হাসিতে।
হায়, এ অসার আমোদরাশিতে,
সঙ্গীতের শত সহস্র নিঃস্বনে,
বিবিধ বাদ্যের মধুর নিক্কনে
বিলাসের এই কোমল আবেশে
উৎসবের এই উন্মত্ত উল্লাসে,
দেবনিন্দিত বস্ত্র আভরণে,
বহুপরঞ্জিত নবীন বসনে,
পড়েনিক চারু ক্ষণেক(ও) তরে।—

এত আমোদ, এত আড়ম্বর,
এতই সুসজ্জা এত অলঙ্কার—
দেখিতেছি ; তবু, হায়, পরিষ্কার
সেই অবিলুপ্ত কলঙ্ক রেখা।
দরবিগলিত সেই সব ক্ষত,
হায় সেই পর পদাঘাত, যত,
তব বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, অধরে,—
সর্ব্বাঙ্গে, শরীরে, ললাট উপরে,—
তবু পরিষ্কার যেতেছে দেখা।

তবে কেন, হায়, এ বিকৃত হাসি ?
কেন এ অযোগ্য আভরণরাশি,
বিকলাঙ্গে ওগো করিয়া ধারণ
হও এ জগতে বিদ্রূপ ভাজন ?
অসার চাপল্যে, হায়, অকারণ
লোকধর্ম্ম কেন হাসাও আর ?
হাসায়োনা আর, হাসিছে বিশেষ
তোমায় হেরিয়ে স্বদেশ বিদেশ।
উচিত তাহার ভূগর্ভে প্রবেশ,
এমত অখ্যাতি দুর্গতি যার !!

শত ইতিবৃত্ত করিয়া মন্থন,
একটী দৃষ্টান্ত তোমার মতন,
পাইনি অদ্যাপি,—পাব কি কখন ?
কি সন্তাপ। ওহো জনমভূমি !
ভারত অধীনা, তুমিও অধীনা,
আর(ও)ত অধীন আছে কত দেশ !
আছে কত দেশ, ছিল কত দেশ
চির অধীনতা শৃঙ্খল বেষ্টন,
কিন্তু হায়, কা রো তোমার মতন
হয়নি ত এত দুর্নাম রটনা,
কেন অপযশ অখ্যাতি ঘোষনা
ধরাতলে পরে হয়নি, হবে না।
দুর্গতে ও হায় দুর্গতা তুমি !!!

* * * *

কোন্ শক্তি তুমি স্মরি, ও বাঙ্গালি !
খুলিলে, কহো। পূজা কর কার
বৎসরে বৎসরে শরতে বসন্তে ?
জাগ্রত, কি সুপ্ত দেবতা তোমার ?

সুসুপ্ত। সুসুপ্ত বঙ্গে মহাদেবী
সুপ্ত বহুযুগ কবালবদনা,
দেবতাবিভ্রমে ক্রীড়ার পুত্তলী
নিরর্থক ওরে কর উপাসনা।

অথবা করিতে শক্তির অর্চ্চনা,
বঙ্গবাসি, নও অধিকারী আর,
বহুব্যভিচারে অশুচি হয়েছে
হৃদয় মানস-শরীর তোমার।

অশুচি, অযোগ্য, অশক্ত বাঙ্গালি,
লাম্পট্য তোমার প্রতিলোমকূপে,
আশৈশব তুমি আছহে আসক্ত ;
শক্তির বিরোধী গুরুতর পাপে।

ক্ষুদ্র কলেবর, ক্ষুদ্রতর মন,
শিথিল সর্ব্বাঙ্গ—শরীরবন্ধন ;—
রমনী অঞ্চল আশ্রয় তোমার !
বিড়ম্বনা তব জীবনধারণ !!

শৈশবের সীমা না হইতে পার
বার্দ্ধক্য তোমায় করে আক্রমণ,
হও জরাগ্রস্ত বিশোলিতচর্ম্ম,
উপস্থিত পূর্ণযৌবন যখন!

কোন্ প্রয়োজন জীবনে তোমার?
কেন দেহযষ্টি করিয়া ধারণ?
এখন(ই) বিনাশ কর বঙ্গনাম,
সাগরের গর্ভে হও নিমগন॥

কিম্বা উপহার দেবীর চরণে
দাও ওরে আজি অযোগ্য জীবন,
হৃদয়শোণিতে জাগাও ভীমায়,
কর প্রায়শ্চিত্ত পাপ-বিমোচন!!

* * * *

রজনী ভাগিল, জগত জাগিল,
অন্ধকার ভেদি উষা প্রকাশিল;
'হৃদমে 'ঘা' দিয়া' বাজিল বাজনা,
করিল প্রভাতী আরতি ঘোষণা।
আনন্দের স্রোতে বঙ্গপরিবার,
নবীন উদ্যমে ভাসিল আবার।
জয় জয় দুর্গে অসুরনাশিনি!
জয় মহাশক্তি। জগত জননি!
হইবে কি মাতঃ?—হইবে কি আর,
বঙ্গ-অঙ্গে কভু শক্তির সঞ্চার?

ঠ, দ,

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিত্তবিনোদিনী। ৺ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ১৮৮৪।

এই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ উপাখ্যান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। প্রীত হইবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা বাঙ্গালী জনসাধারণের অধ্যয়নপ্রিয়তার পরিচায়ক। যত দিন সাধারণলোকে পুস্তকপাঠে অভ্যস্থ না হয়, পানভোজনের ন্যায় অধ্যয়ন করাও তাহাদের দৈনিক জীবনের একটী অঙ্গ না হইয়া উঠে; ততদিন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে পুষ্টিলাভ করে না ও সাহিত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা হয় না। বঙ্গবাসী দিন দিন অধ্যয়নে অধিকতর অভ্যস্থ হইতেছেন, ইহা যৎপরোনাস্তি সুখের বিষয়। কিন্তু যে সকল লোক সাহিত্যব্যবসায়ী, এ সময়ে তাঁহাদের বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করা উচিত, কেন না, সাধারণ রুচির উৎকর্ষাপকর্ষসাধনের ক্ষমতা তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। মানুষের মন স্বভাবতই কতকটা ইতরতাপ্রবণ;—শিক্ষার কার্য্য সেই ইতরতা-প্রবণতার বিনাশ করিয়া রুচি মার্জ্জিত করা। পুস্তকপ্রণেতা ও সাহিত্যজীবিগণ সাধারণের শিক্ষক। বলা বাহুল্য যে, শিক্ষকের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা দেওয়া শিক্ষকেরই হাত।

সুশিক্ষা অমৃত ও কুশিক্ষা বিষ, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বিষের আকর্ষণ বড় প্রবল,—অনেকে জানিয়া শুনিয়াই বিষ খায়, লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। বিষাধারের চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া যায়। কিন্তু যখন কুশিক্ষা বিষ, আর সুশিক্ষা অমৃত, তখন যিনি শিক্ষক, তিনি কুশিক্ষা দেন কেন? ভাগ ত্যাগ করিয়া মন্দ, অমৃত রাখিয়া গরল, লোকের হাতে সজ্ঞানে তুলিয়া দেন কেন? দেন—ব্যবসার খাতিরে। যাঁহারা কেবলমাত্র ব্যবসার অনুরোধে সাহিত্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, লোকের সুশিক্ষা অপেক্ষা, ব্যবসায়ের প্রতিই যাঁহাদের স্বভাবতঃ অধিকতর লক্ষ্য থাকে,—যদ্দ্বারা ব্যবসার পসার বাড়ে, ব্যয়ের অষ্টাদশগুণ আয় হয়, তাহারই উপর নজর রাখিয়া তাঁহারা কার্য্য করেন। সুতরাং ইতরসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া কুশিক্ষাদ্বারা লোকের রুচি কলুষিত করিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন না। 'যেন তেন প্রকারেণ' ব্যবসায়ের আয় বাড়িলেই হইল। কিন্তু ইতরসাহিত্যের কারবারে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানুষের মন স্বভাবতই কতকটা ইতরতাপ্রবণ, যে ক্রম গত ইতরতার প্রশ্রয় দেয় এবং যাহা কুরুচি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, সর্ব্বদাই তাহার পোষণ করে, তাহার প্রতি সাধারণলোকের আপনা হইতেই অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগদ্বারা একদিকে পেশাদার সাহিত্যজীবির মূলধন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অপরদিকে সাধারণ রুচি ও প্রবৃত্তি অধঃপাতের গভীরতম গর্ভে প্রবেশ করে ও দেশমধ্যে একটা অতি কদর্য্য ইতর সাহিত্যের দেখা দেয়। সকল দেশেই এইরূপ কদাচার সাহিত্য অল্পাধিক পরিমাণে আছে। অস্মদ্দেশে ক্রমে ইহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এ সময়টায় সাহিত্যব্যবসায়ি দিগের উচিত, আপন-আপন কার্য্যের গুরুতর বিষয় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা, তারপর কার্য্য করা। নতুবা বাঙ্গালীর আধুনিক অধ্যয়ন-প্রিয়তা ঘোরতর বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে সন্দেহ নাই। ইতর ও অস্বাস্থ্যকর সাহিত্যের মস্তকে খড়্গাঘাত না করিলে 'বিদ্যার বিদ্যায়' নিশ্চয়ই বিশৃঙ্খল ঘটাইবে। অর্থপিশাচদিগের জন্য সংসারে অনেক প্রকার বৃত্তি—ব্যবসা আছে, অতএব যাঁহারা কেবলমাত্র অর্থলোভে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা বৃত্তান্তর গ্রহণ করিলে, ভাল হয়। যাঁহারা স্বভাবতঃ সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্যকে সাহিত্যের জন্য ও হৃদয়মনের উন্নতির জন্য ভাল বাসেন এবং যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশহিতৈষী, কেবল তাঁহারই আমাদের এই প্রস্ফুটোন্মুখ সাহিত্যের অধিনায়ক হন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

চিত্তবিনোদিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষ্য করিয়া উপরিলিখিত কথাগুলি বলা হইল, এ জন্য কেহ যেন মনে না করেন যে, চিত্তবিনোদিনী কদর্য্য পুস্তক। চিত্তবিনোদিনীর আর যে দোষই থাকুক, উহা রুচিকর নহে; উহার উদ্দেশ্য বস্তুতই বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করা এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, উহা দ্বারা বঙ্গবাসীর চিত্ত বিমোহিত না হউক, নিশ্চয়ই বিনোদন হইয়াছে; কেন না, চিত্তের বিনোদনকল্পে, গ্রন্থকারের যতদূর ক্ষমতা, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটী করেন

নাই। পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই আছে। "চিত্তবিনোদিনী" প্রণেতা পরলোকগত, তাঁহার পরিশ্রম পুরস্কৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। চিত্তবিনোদিনী প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস (Novel) নহে। ইংরাজীতে যাহাকে (Tale) টেল বলে উহা তাহারই কাছাকাছি। অতএব উহাকে আখ্যায়িকা বা উপাখ্যান বলিলে অতি হয় না। ঘটনাবৈচিত্র বা বিবিধ ঘটনার সৃষ্টি ও সমাবেশ যদি আখ্যায়িকাগ্রন্থের গুণগরিমার পরিচায়ক হয়, তবে সমালোচ্য গ্রন্থ উপাখ্যান-অংশে ন্যূন নহে। এই গ্রন্থে বিচিত্র ও বিবিধ ঘটনার অল্পতা নাই, বরং আধিক্যই আছে। ১৮৫৭—৫৮খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহমূলক স্থূল স্থূল ঘটনার সঙ্গে সেই দুরূহ সময়োপযোগী বিবিধ ঘটনা সৃষ্টি করিয়া চিত্তবিনোদিনীতে সমাবেশ করা হইয়াছে। ঘটনাবৈচিত্রের ন্যায় প্রেম বৈচিত্র্যেরও ইহাতে অভাব নাই। তার পর এই গ্রন্থে লিখিত প্রেমের মধ্যে একটু অভিনবত্বও আছে। যে কয়েকটী প্রেমের ব্যাপার, তাহার প্রায় সমস্তই কালায় শাদায়;—গ্রন্থের প্রধান নায়িকা চিত্ত-বিনোদিনী নিজেই ইংরাজ-দুহিতা। সমগ্র গল্পটী মোটের উপর সাজান বেশ হইয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত 'মরা বাঁচান' অদ্ভুত ব্যাপারগুলা যেন 'কেমন কেমন' বোধ হয়। তবে ইহার 'কৈফিয়ত' উপসংহারের একস্থানে দেওয়া হইয়াছে,—"যে দেশে মিলন না হইলে যাত্রা ভাঙ্গে না, যে দেশে কপালকুণ্ডলার পুনর্জীবন হয়,—তথায় শোচনীয় ব্যাপারে গ্রন্থ শেষ করা অন্যায়। 'কাগজে না থাকে, গল্পে না কুলায়, ঘটনায় না বলে, মিলন দেখাইয়া দিতেই হইবে। নতুবা স্ত্রীসমাজে সমাদর হয় না"। তাই 'উপরোধে নায়ক বাহন' গলাধঃকরণ করিয়া, মারিয়া বাঁচাইয়া, 'মিলন' দেখান হইয়াছে।

চিত্তবিনোদিনী অতি উচ্চ অঙ্গের কল্পনাপ্রসূত না হইলেও মোটের উপর বেশ বই'। ইহার ভাষা সাবেক 'সাধুভাষা' ও আধুনিক 'নবেলী' ভাষার মধ্যবর্ত্তী, বরং সাধুভাষার কিঞ্চিদধিক পক্ষপাতী বলিলেও বলা যাইতে পারে।

চিত্তবিনোদিনীতে যতগুলি চিত্র আছে তন্মধ্যে পশ্চিমে বাঙ্গালী বৃদ্ধ কাশীনাথ বসুর চিত্রখানি বেশ হইয়াছে। পাঠক, বসুজমহাশয়ের বেশবিন্যাসের ঘটা দেখুন,—

"বসুজমহাশয়ের সে-কালের পোষাক, মস্তকে হাতেবাঁধা শাদা পাগ্‌ড়ী, পরিধান ঘাঘ্‌রাওয়ালা যোড়া ও ঢল্‌ঢলে ইজার, এবং মোজাবিহীন পায়ে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত শুণ্ডবিশিষ্ট জরীর জুতা। কপালে ও কর্ণমূলে রক্তচন্দনের ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা। গৃহে নাইটক্যাপ, বেনিয়ান ও কাষ্ঠপাদুকা বেশ। হস্তে একখানি সোণার ইষ্টিকবচ, কটিদেশে কোঁপাগোট ও টিকিতে একটী সোণার মাদুলী এবং গলায় তুলসীমালা। বিদ্যা—উত্তমরূপে শিক্ষা—পারস্যভাষায় হইয়াছিল। ইংরাজী শতবুড়ী শব্দ (২০০০ কথা) শিখিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলীতে আজও নূতন নূতন কথা নিবেশিত হইতেছে, যথা,—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, গ্যাস ইত্যাদি"।

গুরুদাসবাবুর যত্নে 'চিত্তবিনোদিনীর' মুদ্রণকার্য্যাদি ও পরিপাটী হইয়াছে।

সার সংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

বান্ধব—অষ্টম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা। আষাঢ়, ১২৯১।

বিষয়।

১। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালায় বাণিজ্য।—(শ্রীশাঃ—)।
২। অগ্নিকুল—উপন্যাস।
৩। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী।
৪। সকলেই ছেলেমানুষ। (শ্রীবাহা—)।
৫। শ্রীমদভগবদ্গীতার সারমর্ম্ম। (শ্রীনী—)।
৬। নিন্দা ও প্রশংসা।
৭। ডাক্তার সাহেবের মেম। (শ্রীরাহা—)।
৮। নানাকথা।

১। এই প্রবন্ধে বাঙ্গালার বাণিজ্যের অধঃপতনের কাল নির্দ্ধারিত ও তাহার ইতিবৃত্ত বিবৃত হইয়াছে। মুসলমানদের রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালার বণিকগণ বিস্তীর্ণ অর্ণবপোতে পণ্য লইয়া সিংহল, জাবা, সুমিত্রা, ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপপ্রভৃতিতে যাতায়াত করিত, এবং স্থলপথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া মগধ, তিব্বত, চীন প্রভৃতিদেশে বাণিজ্যার্থ যাইত। মুসলমানগণ বণিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, এই কারণে মুসলমানদের সময়ে বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। অতএব হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদের রাজত্বসময়ে বঙ্গদেশ বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল "এবং ইহার প্রজাগণ তৎকালিক শাসন-প্রণালীর অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারসত্ত্বেও পরমসুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনে এই সুখের রাজ্য ছারখার হইয়া যায়"।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে পর্ত্তুগিজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ এ দেশে বাণিজ্য করিতেছিল এবং তাহাদের বাণিজ্যে বাঙ্গালার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

ইয়ুরোপীয় বণিকগণ স্বদেশ হইতে যে পণ্য আনিতেন তাহার মূল্য, ইয়ুরোপে রপ্তানীর জন্য যে পণ্য ক্রয় করিতেন তাহার অপেক্ষা, অতি অল্প হইত। অতএব তাহাদিগকে দেশ হইতে টাকা আনিতে হইত। বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত বিভিন্নদেশ হইতে প্রতিবৎসর ১, ৪৩, ১৬, ০০০৲ টাকা বাঙ্গালাপ্রদেশ মুনফা করিত। বাণিজ্যের দরুণ বাঙ্গালা হইতে কোন মুদ্রা বিদেশে যাইত না। এবং সম্রাটকে কেবল বৎসর বৎসর এক কোটী করিয়া টাকা দিতে হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই উভয় টাকা কাটাকাটি করিয়াও বাঙ্গালা প্রদেশের ধনসমষ্টিতে প্রতিবৎসর ৪৩,-৬০,০০০টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইত।" "১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচলিত

নিয়মানুসারে বাণিজ্য করিতে থাকে।' তাহার পর, তাহাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। হামিল্টন নামক একজন ইংরাজবৈদ্য, চিকিৎসা করিয়া, দিল্লীর সম্রাটের কন্যাকে আরোগ্য করেন। হামিল্টন অন্যান্য পুরস্কারমধ্যে ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য এই এক অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন যে, কোম্পানীর যে সকল মাল একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইবে সেই সকল মালের উপর কোন শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না। এই অনুগ্রহলাভের পর ইয়ুরোপীয় অন্যান্য বণিকগণ অপেক্ষা ইংরাজদের অধিক সুবিধা হইল। কোম্পানীর অধ্যক্ষ কেবল রপ্তানী ও আমদানী মালের জন্য দস্তক স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। তাহার পর কোম্পানীর নাম দিয়া আপনারা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। "এবং তাহাদের পণ্য ও কোম্পানীর অধ্যক্ষের দস্তক দেখাইয়া বিনাশুল্কে যথা ইচ্ছা তথায় নীত হইতে লাগিল। কোম্পানীর ভৃত্যগণ এই চাতুরী-অবলম্বন করিয়া দেশীয় বণিকগণের সমগ্র বাণিজ্য একেবারে গ্রাস করিয়া বসিল।" কোম্পানীর অধ্যক্ষও ঐ বাণিজ্যে যোগ প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দেশের অন্তর্বাণিজ্যও নিজ হস্তে লইলেন। নবাব জাফর খাঁ দেশের অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া আদেশ করিলেন যে, "অন্তর্বাণিজ্যের জন্য যে সকল পণ্য বাহিত হইবে, তাহা, কোম্পানীর দস্তক প্রদর্শিত হইলেও, ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না"। কিন্তু জলপথে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতভাবে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। "দেশীয় বণিকগনের জলপথে বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল। বাঙ্গালার বাণিজ্যের অধঃপাতের এই সূত্রপাত হইল। এইরূপে ইংরাজগণ বাঙ্গালার অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর মিরজাফর ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে "সোরার একচেটিয়া ব্যবসায় করিতে অনুমতি দিলেন"। কোম্পানী এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, এই উপলক্ষে বহু লোকের সর্ব্বনাশ হইল। তাহার পর ইংরাজদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। "মিরকাশেম দেখিলেন, এইরূপ অবস্থায় রাজ্য করা অপেক্ষা না করাও ভাল"। তিনি কোম্পানীর গবর্ণরের নিকট অনেক চিঠি লিখিলেন, অবশেষে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন, দেখা হইবার পর, উভয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইল, তাহার পর ধার্য্য হইল যে "কোম্পানীর ভৃত্যগন নিজ নামে যে বাণিজ্য করিবে, তজ্জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহারা নবাবকে শুল্ক প্রদান করিবে। এই শুল্কের হার নয় টাকা ধার্য্য হইল"। কোম্পানীর ভৃত্য এই শুল্ক দিতে অস্বীকার করিল। মিরকাশেম তখন বলিলেন, "যদি কোম্পানীর ভৃত্যগন এই শুল্ক দিতে অস্বীকৃত, তবে তিনি আপন প্রজাদিগের নিকটও শুল্ক গ্রহণ করিবেন না"। ইংরাজগণ বিবিধভয়প্রদর্শন করিয়া নবাবকে লিখিলেন, "আপনি আপনার প্রজার প্রতি কোন প্রকার শুল্ক বহিত করিতে পারিবেন না"। "উভয় পক্ষে ঘোরতর মনোবিবাদ উপস্থিত হইল। রাজ্যলোলুপ মিরজাফর তাহাদের তাবৎ প্রস্তাবে সম্মত হইল। "কোম্পানীর ভৃত্যগন একমাত্র লবনের উপর শতকরা ২৷৷০ টাকা শুল্ক দিবে, অন্য কোন জিনিসের উপর শুল্ক দিবে না। নবাবের নিজ প্রজাদের উপর পূর্ব্বপ্রচলিত শুল্ক বজায় থাকিবে, তাহা রহিত কিম্বা হ্রাস হইতে পারিবে না"। মিরকাশেম বক্সার-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া,

বাঙ্গালা হইতে পলায়ন করিলেন। কোম্পানী জড়পিণ্ড মিরজাফরকে ধরাধরি করিয়া সেই সিংহাসনে বসাইল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করিলেন। কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইল। তিনি ভৃত্যগনের অন্তর্বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু "তিনি নিজে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না উক্ত সনেই লবনের এক ইজারা গ্রহন করিলেন। ডিরেক্টারগণ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কৌন্সিলের নিকট বিশেষ তাড়া দিয়া চিঠি লিখিলেন। কিন্তু কৌন্সিলের মেম্বারগণই তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। ডিরেক্টারদিগের আদেশ প্রতিপালন করিতে তাঁহাদের সহসা প্রবৃত্তি জন্মিল না। কিন্তু আবার সে আদেশকে স্পষ্টরূপে অবজ্ঞাও করিতে পারেন না। 'অবশেষে অনেক চিন্তার পর ১৭৬৫ সালের ১০ ই আগষ্টে এক সভা হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, কোম্পানীর ভৃত্যগণ আর স্বনামে কোন বাণিজ্য করিবে না, কিন্তু তাহাদের ইহাতে যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণের জন্য লবন সুপারি ও তামাক— এই তিন দ্রব্য ১ বৎসরের জন্য একচেটিয়া হইবে, কোম্পানীর উর্দ্ধতন ভৃত্যগণ এই একচেটিয়ার লাভ প্রাপ্ত হইবে"। এই ব্যবসায়ের জন্য একটি কমিটি থাকিবে। মোট মুনফা হইতে ১০ লক্ষ টাকা কোম্পানী পাইবেন। বাকী মুনফা কোম্পানীর ভৃত্যগন নির্দ্ধারিত হারে ভাগ করিয়া লইবেন। একবৎসর যখন গত হইল; উহাতে যথেষ্ট লাভ হইতেছে দেখিয়া আর একবৎসর তাহা বজায় রাখা স্থিরীকৃত হইল। ডিরেক্টারগণ এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অনেক লিখালিখির পর ১৭৬৭ সনের ১৪ মার্চ তারিখে একচেটিয়া কমিটি ভঙ্গ হয়।

ভারতী। অষ্টম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা। শ্রাবণ, ১২৯১।

বিষয়,—

১। কথাবার্ত্তা। *(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
২। বিলাতে ছাত্রজীবন।
৩। ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্রের বিষয় দুই একটি কথা। (শ্রী—)।
৪। অতিথি-আগমন—পদ্য। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।
৫। ভাউসাহেবের খবর।
৬। সরোজিনী-প্রয়াণ।
৭। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। (শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী)।
৮। বেদেশী ফুলের গুচ্ছ। (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
৯। মণ্ডনশঙ্কর সংবাদ। (শ্রীদ্বিজদাস দত্ত)।
১০। পারমাণবিক সিদ্ধান্ত। (শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়)।
১১। সংক্ষিপ্ত সমালোচন।
১২। উত্তর।

৭। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। জগতের সকল পদার্থই—কঠিন, তরল ও বাষ্পময়—এই তিনের কোন না কোন অবস্থায় অবস্থিতি করে; এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণের এত দিন পর্য্যন্ত ছিল। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্রুক্স পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কার করিয়াছেন'। তাহারই বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। পদার্থজগৎ পরমাণুদ্বারা গঠিত। যৌগিক পদার্থের সুক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকেই

পরমাণু বলা যায়, কিন্তু এই পরমাণুর অস্তিত্ব মনশ্চক্ষুঃ দ্বারাই ধারণা করা যাইতে পারে। অতিক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণও কোন পদার্থের পরমাণুরাশি দেখিতে পায় না। পরমাণুসকল পদার্থের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থান করে না। একাধিক পরমাণু একত্রিত হইয়া একটি বিন্দুরূপে স্থিত হয়, এইরূপ পরমাণুর সম্মিলিতবিন্দুকে অণু কহে"। পদার্থমাত্রই অণুরাশির সমষ্টি এবং "সকল অবস্থাপন্ন পদার্থেরই অণুদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ব্যবধান আছে, অণুগুলি সেই স্থানমধ্যে বিকম্পন করিতেছে"। কঠিন পদার্থের অণুগুলির মধ্যে ব্যবধান অত্যল্প, "এবং সেই অল্পস্থানেই তাহাদের বিকম্পন আবদ্ধ"। যে পদার্থের কঠিনত্ব যত অল্প তাহার অণুগুলির মধ্যে তত স্থান ব্যবধান—মাত্রা অধিক। অতএব কঠিন পদার্থের অপেক্ষা তরল পদার্থের অণু সংযোগ ঘন। আবার সেই কারণে তরল পদার্থ অপেক্ষা বাষ্পীয় অণুর বিকম্পন আরও প্রশস্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে, "বায়ুবিরল কাচপাত্রমধ্যস্থ অতি লঘু বাষ্পের (গ্যাস) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অণুবিকম্পনপথ"। কিন্তু "প্রকৃতপক্ষে এতদিন কোন বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রদ্বারা, কাচনলকে অধিক মাত্রায় বায়ুবিরল করা যাইত না।" সম্প্রতি ক্রুক্‌সের এক নূতন উপায়দ্বারা কোন নল হইতে অনেক অধিক পরিমাণে বায়ু বাহির করিতে পারা যায়, "এবং এইরূপে একটি কাচনলে বায়ু-অণুর সংখ্যা এত কমান যাইতে পারে যে, সেই অবস্থায় অভ্যন্তরস্থ অণুদিগের বিকম্পন পথ স্পষ্ট অনুভূত হয়। কেবল ইহাই নহে, এই বিকম্পন-পথের মাত্রা পর্য্যন্ত তখন মাপা যাইতে পারে। অণুদিগের এইরূপ অতি দূর-দূর অবস্থিত অবস্থাই পদার্থের চতুর্থ অবস্থা"। চতুর্থ অবস্থায় একটি অণু আর একটি অণুর গাত্রস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে কিছু দূর চলিয়া যায়, পরে সেখান হইতে আবার ফিরিতে থাকে, এবং এইরূপ গতির পথ স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান হয়। কিরূপ পরীক্ষাদ্বারা এই বিকম্পন-পথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিষয় একটু এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। পাঠকদিগের উহা সহজবোধ্য হইবে না বলিয়া এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ইয়ুরোপের এই নূতন জ্ঞান যে ভারতের নিকট পুরাতন, লেখিকা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের মতে পদার্থের দুই রূপ, সংঘাতরূপ (কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়) ও পরমাণুরূপ। এবং যোগশাস্ত্রের মতে পদার্থ সপ্তবিধ—স্থূল (কঠিন, তরল ও বায়বীয়) স্বরূপ,—সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব।

প্রবাহ—৪র্থ সংখ্যা, ৩য় ভাগ। শ্রাবণ, ১২৯১।

১। ন্যায়দর্শন।

২। আমি—অষ্টম পত্র।

৩। সূতিকাগৃহ। এই প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন যে গর্ভমুক্ত নারীকে প্রথম ৭।৮ দিন অনবরত শয্যায় শায়িত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। প্রসবের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ইষ্টকনির্ম্মিত সূতিকাগৃহ হইলে, তাহার আয়তন ১০×৭ হস্ত আর কাঁচা হইলে ১০×৬ বা ৯×৭ হস্ত হওয়া আবশ্যক; অপিচ উহা উচ্চ, শুষ্ক, দ্বারবাতায়নবিশিষ্ট ও জনকোলাহল বিবর্জ্জিত হওয়া মঙ্গলজনক।

৪। শুষ্কপত্র—পদ্য।

৫। হিবোল।

৬। সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবল। লেখক এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, চরিত্রবল সকল কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক এবং সত্যনিষ্ঠা উহার সহযোগী। এই দুইটিকে পৃথক্ করা দুষ্কর।

৭। ভারতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক।

৮। খদ্যোৎখণ্ড।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

রাজার একটি প্রধান কর্ত্তব্য প্রজাপালন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ রাজার এ কর্ত্তব্যবোধ নাই, কঠোর শাসন মন্ত্রেই ইংরাজ সুদীক্ষিত। রাজত্ব করিব—তরবারির অগ্র, তাহাতে আবার প্রজার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কি? ইংরাজ এইরূপ ভাবেন, এবং বলদর্পে দর্পিত হইয়া, মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া, নিরীহ ভারতবাসীর হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার করিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহাদের এক একটি শাসনকর্ত্তা এক একটি জাতীয় দর্প এবং দম্ভের অবতারস্বরূপ। তাহার উপস্থিত জলন্ত দৃষ্টান্ত—বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্টগবর্ণর মাননীয় টমসন সাহেব বাহাদুর। টমসন বাহাদুর আজকাল বড়ই কোপাবিষ্ট। শিক্ষিত বাঙ্গালী বড়ই বাচাল হইয়াছে, সে অনেক সময়ে অযথা তেজস্বিতা প্রদর্শন করে; অনেক সময়ে মনুষ্যোচিত স্বতন্ত্রস্বাধীনতা পাইবার প্রয়াস করে, অনেক সময়ে নানাপ্রকার বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া ইংরাজের দোষ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আর এ সমস্ত সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি এবার কৃতসঙ্কল্প যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর তেজস্বিতা ও স্বাধীনতাস্পৃহা ঘুচিবে, লোপ করিবেন এবং তজ্জন্য দুইটি মহৎ উপায় অবলম্বন করিয়া ছেন। প্রথম, লর্ড রিপন যে আত্মশাসন ক্ষমতা দিবার প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যতঃ নিষ্ফল করা। প্রকাশ্যে তাহার আইন হইবে, এবং সে ক্ষমতা দেওয়া গেল বলিয়া ঘোষণা হইবে; কিন্তু ভিতরে (কার্য্যতঃ) সে ক্ষমতা কাহাকেও চালনা করিতে দিবেন না। দ্বিতীয় উপায় প্রথমের অপেক্ষা আরও চমৎকার এবং কৌশলপূর্ণ। স্কুলে যে ছাত্রেরা আজ বালক বলিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, তাহারাই কিছু দিন পরে শিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক হইয়া আবার তেজস্বিতাপ্রকাশ এবং বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া জ্বালাতন করিবে। অতএব গোড়া হইতে একেবারে ইহার রাস্তা বন্ধ করা হউক—অর্থাৎ সেই ছেলেদের হৃদয়ের মধ্যে এখন হইতে এরূপ ইংরাজভীতি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া যাউক, যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা আর মুখ তুলিয়া কথা কহিতে না পারে, মূকের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; আর গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা কিছু অনুগ্রহ প্রদান করিবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্দ্দশ পুরুষের সহিত কৃতকৃতার্থ মনে করে!

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে এই বুদ্ধি বাহির করিয়া একজন চমৎকার প্রতিভাশালী রাজনীতিজ্ঞের মত কার্য্য করিয়াছেন, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? এত দূরদর্শিত্ব এবং সূক্ষ্মদর্শিত্ব রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ছোটলাটের সহকারী জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিও এরূপ প্রভুভক্ত যে, তাঁহারা আজকাল কায়মনোবাক্যে পূর্ণমাত্রায় আপন প্রভুর এই অলৌকিক রাজনীতি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকা এবং কৃষ্ণনগরের মোকর্দ্দমা তাহার দৃষ্টান্ত।

ইংরাজেরা গোড়াতেই ভয়ানক ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন—বাঙ্গলায় স্কুলকলেজ স্থাপন এবং উচ্চশিক্ষার প্রচার করিয়া। তখন ভাবেন নাই যে, লেখাপড়া শিখিলেই লোকের বুদ্ধি খুলিবে; বুদ্ধি খুলিলেই ন্যায়ান্যায় বুঝিবে; এবং ন্যায়ান্যায় বুঝিলেই তাহা প্রকাশ করিয়া প্রতিকথার আন্দোলন উত্থাপিত করিবে। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" এখন "হাত পা কামড়াইলে" ফল কি? এখন ইংরাজেরা যত এরূপ করিবেন, যতই লোকের স্বাভাবিক সত্ত্বের প্রতি আঘাত করিবেন, ততই প্রজার বিরাগভাজন হইবেন। অতএব ছোটলাট বাহাদুর আজকাল বাঙ্গালাশাসন সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই সুফলপ্রদ হইবে না। এখন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতির আবশ্যক। এখন রাজপুরুষদিগের কার্য্যকলাপে এবং গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিতে দয়া, উদারতা, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রিয়তা ইত্যাদি সদ্‌গুণের নিতান্ত আবশ্যক। নচেৎ রাজ্যমধ্যে কিছুতেই অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

আজকালের ইংরাজরাজত্বের রাজনীতি যত আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, তত বিষণ্ণ এবং ক্ষোভে আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। শতাধিক বৎসর রাজত্ব করিয়া কোথায় ইংরাজ ক্রমশঃ প্রাজ্ঞতা লাভ করিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া ক্রমশই তাঁহার বুদ্ধিলোপ হইতেছে! এই শতাধিক বৎসরের রাজত্বমধ্যে ইংরাজ অনেক মহত্ত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তৎসঙ্গে অনেক ভয়ানক ভয়ানক ভ্রমও করিয়াছেন, এবং আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেই ভ্রমের পরিণাম এত মন্দ হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মহত্ত্বজনিত যত সুফল, সমস্তই সমাচ্ছাদিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহার প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান ভুল এই যে, তিনি দেশের আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্য সর্ব্বতোভাবে আপন হস্তে লইয়াছেন; এবং সেই কার্য্য করিবার জন্য উচ্চবেতন দিয়া সহস্র সহস্র আপনার স্বদেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ করাতে চারিটি ভয়ানক অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম, দেশের লোকেরা সকলপ্রকার শাসনক্ষমতাচ্যুত হইয়া নিঃসহায় অবস্থায় সর্ব্ব বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়,—যে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দেশীয় চিরপ্রচলিত প্রথাসমস্তের সম্পূর্ণ বিরোধী; সুতরাং তাহাতে দেশবাসিদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, এবং তজ্জন্য তাহা হইতে সদাসর্ব্বদাই তাহাদের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল সাধিত হয় না। তৃতীয়,—শাসনপ্রণালীতে সহানুভূতি নাই বলিয়া শাসনকর্ত্তাদিগের সঙ্গেও লোকের সম্পূর্ণ সৌহৃদ্য হইতে পায় না; সেজন্য এবং

জিতের মধ্যে ভয়ানক জাতি এবং বর্ণবিদ্বেষ তাহার ফল। এবং চতুর্থ,—যে প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা এত ব্যয়সাপেক্ষ যে তাহা যোগাইতেই দেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে, নানাপ্রকারে আয় বৃদ্ধি হইলেও, নূতন নূতন ট্যাক্স বসিলেও, রাজস্বমধ্যে কখন স্বচ্ছলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইংরাজের এই একটী ভুলের জন্য ভারতবর্ষে এতগুলি অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা ইংরাজ স্বচক্ষে দেখিতেছেন, এবং অনেক বিষয়ে তাহা স্বীকারও করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভুল জানিয়াও এবং তাহা স্বীকার করিয়াও, তাহা সংশোধন করিতে তাঁহার কোন ইচ্ছাই নাই। দেশের লোকেরা আজকাল লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহারা এসমস্ত কথা আজকাল সম্যক বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তাঁহাদিগকেও সদাসর্ব্বদা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইংরাজের এমনই দম্ভ, এমনিই আত্মম্ভরিতা, যে, দেশের লোক দুইকথা বলিতে যাইলেই তাহাদের উপর তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, এবং তাহারা অত্যন্ত বাচাল, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ,—এমন কি রাজদ্রোহী পর্য্যন্ত—বলিয়া তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন। এ বড় ভয়ানক অবস্থা! এ অবস্থা যে কিসে দূর হইবে, তাহা ঈশ্বরই অবগত আছেন।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, এবং আয়র্লণ্ড যেরূপ মহারাণীর রাজত্ব, ভারতবর্ষও প্রায় সেইরূপ। কিন্তু ভারতবাসিদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি যেরূপ স্বয়ং মহারাণী এবং তাঁহার মন্ত্রিসমিতির দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় রাজত্ব সেরূপ নহে। এখানে মহারাণী কিম্বা তাঁহার মন্ত্রিদিগের কোন সাক্ষাৎ হস্ত নাই, কয়েক সহস্র ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের হস্তে এরাজ্য সম্পূর্ণরূপে অর্পিত। সেই কর্ম্মচারীরা যথেচ্ছ রাজত্ব করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের উপরওয়ালা কেহ নাই বলিলেও একবারে অসঙ্গত হয় না। এই পৃথগ্‌ভূত ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিত্ব নিবারণ করিবার জন্য মহারাণীর "চরফ্" হইতে কেবল দুইটি সামান্যমাত্র উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তাহা এই যে, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ এই উভয় স্থানেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মস্তক স্বরূপ যে দুইজন কর্ম্মচারী আছেন—ষ্টেটসেক্রেটরি এবং গবর্ণরজেনারেল—ইঁহারা দুইজনেই স্বয়ং মহারাণী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। মহারাণী এবং ইংলণ্ডীয় ইংরাজ জাতি মনে করিয়া থাকেন যে, মস্তকোপরি যখন দুইজন এরূপ নিঃসম্পর্কীয় এবং অসংসৃষ্ট উচ্চকর্ম্মচারী থাকিলেন, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে কোনরূপ অন্যায় কিম্বা অবিচার ঘটিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা বলি, এই প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসিত হওয়াতেই, তাহার এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কর্ম্মচারীরা ইহাকে তাঁহাদের নিজ জমীদারী ভাবিয়া লইয়াছেন, এবং সেইরূপ ভাবিয়াই তাঁহারা ইহার উপর যথেচ্ছ আচরণ করিয়া থাকেন। পুরুষপুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া তাঁহাদের এরূপ আভ্যন্তরিক বল জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হইতে নিম্নতম আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত তাঁহাদের দল এরূপ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ, যে তাঁহাদের সে ব্যূহমধ্যে নূতন

কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া যে, তাঁহাদের বিপরীতে কোন মত চালাইবেন, তাহার যো নাই। গবর্ণর জেনরেল কিম্বা ষ্টেট সেক্রেটরি নূতন লোক। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নূতন নূতন আসিয়া কখন কখন নূতন মত চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন তাঁহারা সহস্র সহস্র শ্বেতবর্ণ কর্ম্মচারিদিগের বজ্র বৃহের সম্মুখীন হন, তখন অচিরাৎ তাঁহাদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া হয় পলাইতে হয়, না হয় উক্ত কর্ম্মচারিদিগের রায়ে রায় দিতে হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্বের অবস্থা ঠিক এইরূপ, এবং যত দিন যাইতেছে, তত এই অবস্থা দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

মহারাণী এবং ইংরাজজাতি ভারতবর্ষের রাজত্ব করিয়া যে সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের দায়িত্ব অনুযায়িক কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন কিম্বা করিতেছেন, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। ভারতবর্ষই আজকাল তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজ্য, তাঁহাদের যে এত সুখ, ঐশ্বর্য্য, ধন সম্পদ, তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই হইয়াছে। এই রাজত্ব যে চিরকাল তাঁহাদেরই থাকে, ইহা অবশ্যই তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুখৈশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ স্বরূপ যে ভারতবর্ষের প্রজা—সেই প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায় কি না, এবিষয়টা তাঁহারা দেখেন না। তাঁহারা অবশ্য ভাবেন, "যে যাহা হইতেছে হউক, ভারতবর্ষের মত এত বড় বৃহৎ রাজ্যের সাক্ষাৎ ভার হস্তে লওয়া বড় কঠিন এবং বৃহৎ কার্য্য; ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীরা যাহা করিতেছেন, বেশ করিতেছেন; মোটের উপর কেবল এইটা দেখা চাই যে এমন রাজত্বটা কোন প্রকারে হাত ছাড়া না হইয়া যায়।" তাঁহারা ঠিক এইরূপ ভাবিয়াই বসিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধিত হইল? না—তাঁহাদের দায়িত্বের উপযুক্ত কার্য্য করা হইল? কখনই নহে। কিন্তু মহারাণী এবং সাধারণ ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষের উপর এইরূপ উদাসীন ভাব। তাহার ফল, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীরা বিলাতে গিয়া আপনাদিগের কার্য্যকলাপের এত প্রশংসাবিস্তার করিয়া থাকেন যে, তাহাতে আরও ইংরাজজাতির উপরোক্ত উদাসীনতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এদিকে ভারতবর্ষে হাহাকার শব্দ। এমনি রাজত্বের গুণ, এমনি রাজকর্ম্মচারিদিগের দক্ষতা যে, একশত বৎসরের রাজত্বেই লোকে "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে ডাক ছাড়িতেছে। বাস্তবিক এমন ভয়ানক, হৃদয়ের রক্তশোষণকারী রাজত্ব ভারতবর্ষে আর কখন হয় নাই। মুসলমানের রাজত্ব অত্যাচারী ছিল, কিন্তু সে রাজত্বেও সাধারণ প্রজাবর্গের এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। ইংরাজ ভারতবর্ষে যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার রাজত্বের উজ্জ্বল তারকা, নচেৎ আর সমস্তই অমানিশা। তিনি মুসলমানকেও "ভাল" বলাইয়াছেন।

কিন্তু এক্ষণে এ অবস্থার উপায় কি? উপায়, আমরা বলি, আর কিছুই নহে—কেবল আন্দোলন। দেশশুদ্ধ লোক একত্রিত হইয়া, একমত হইয়া, এক প্রণালীবদ্ধ হইয়া, এক সমিতিবদ্ধ হইয়া কেবল আন্দোলন করিতে হইবে। তবে যদি সময়ে—কিছুকাল পরে কোন উপায় হয়। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতবর্ষ এবং ইলণ্ড উভয় স্থানেই করিতে হইবে। ভারতবর্ষে

কাল 'কতকমতক' আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে ভয়ানক গৃহবিচ্ছেদ আছে, এখনও বহুপ্রদেশস্থ লোক অনভিজ্ঞ এবং উদাসীন আছে যাহাতে সে সমস্ত অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়,—যাহারা একথা বুঝিয়াছে, তাহাদের সকলে মিলিয়া—এবিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরে ইংলণ্ডেও আন্দোলনকার্য্য সমাকরূপে করিতে হইবে। ভারতবর্ষের আন্দোলনে এখানকার কর্ম্মচারীরা কখন বিরক্ত হইয়া কখনও বা প্রসন্ন হইয়া কোন উপকার করিতে পারেন, কিন্তু ইংলণ্ডের আন্দোলন হইতেই (করিতে পারিলে) আমাদের বিশেষ সুফল পাইবার সম্ভাবনা। দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যে সেখানকার আন্দোলন করিতে হইবে। প্রথম, তথাকার লোকদিগের ভ্রম দূর করা এবং দ্বিতীয়, যাহাতে মহারাণী এবং মন্ত্রিসমিতি ভারতবর্ষের রাজত্বের শাসনক্ষমতা কতকপরিমাণে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাহার উপায় করা। এই দুইটি কার্য্য বড় সহজ নহে, ইহাতে প্রভূত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা, এবং সেই জন্য ইহাতে সমগ্র ভারতবর্ষের একত্রীভূত চেষ্টা চাই। মুহাত্মা ষ্ট্র্যাণ্ড্ সাহেব সম্প্রতি যে প্রস্তাব করিয়াছেন,—অর্থাৎ বিলাতস্থ ষ্টেট সেক্রেটরির সভা উঠাইয়া দিয়া ভারতশাসনের ক্ষমতা পার্লিয়ামেণ্টকর্ত্তৃক নিয়োজিত একটি অনুসভার হস্তে প্রদত্ত হয়,—তাহা আমাদের বিবেচনায় অতি সদুক্তি। এইরূপ হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ দূরীভূত হইবে। তৎপরে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষীয় দুই এক জন লোক আপাততঃ মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, তাহাও খুব ভাল। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ বিলাতে রহিয়াছেন, এবং শুনিতেছি অনেক মহাশুভব ইংরাজ তাঁহার মেম্বর হওনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ মেম্বর লওয়া পার্লিয়ামেণ্টে নিয়ম নাই; এবং সে নিয়ম যে শীঘ্র হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। তবে, লালমোহন বাবু যদি মেম্বর হয়েন, তাহা হইলে ইংলণ্ডেরই কেন কাউন্টির প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিতেছি, এসম্বন্ধে চেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে বহুতর অর্থের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হওয়া চাই। বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদের পক্ষে একটি নূতন স্বত্ব পাইবার এই অতি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষীয় সভ্য" একথা বলিলেও ইংরাজেরা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু যখন অনেকগুলি মহদাশয় ইংরাজ আপনা হইতে এ বিষয়ে অভিমত প্রদান করিয়াছেন, তখন এমন সুবিধা আমাদের কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এ সুবিধা একবার হারাইলে আর সহজে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অতএব এবিষয়ে আমাদের এতদ্দণ্ডেই বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। উপস্থিত প্রয়োজন—কিছু অর্থের। এই অর্থ যাহাতে অবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বোধ করি এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। সুরেন্দ্রবাবু যে ন্যাশনাল ফণ্ডের টাকা উঠাইতেছেন, তাহা হইতে কি এই ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে না? আমরা বিবেচনা করি, এইরূপ ব্যয়ই ন্যাশনাল ফণ্ডের উপযুক্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন উপস্থিত প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া সমগ্র দেশ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করুন। যে টাকা উঠিবে, তদ্দ্বারা ন্যাশন্যাল ফণ্ড বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু ইতিমধ্যে, যাহা জমিয়াছে, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় টাকা অবিলম্বে বিলাতে প্রেরিত হউক। ন্যাশনাল ফণ্ডের প্রস্তাবনার সময় অনেক লোক নাসিকা উত্তোলন করিয়া ইহার অনাবশ্যকতা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ ফণ্ড আবশ্যক কি না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত প্রকৃতি যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন, যে আন্দোলন—অজস্র আন্দোলন—

নির্ভীক আন্দোলন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের অটল মন কিছুতেই বিচলিত হইবে না। কিন্তু আন্দোলন করিতে হইলেই প্রতি কথায় অর্থের আবশ্যক, এবং তাহা হইলেই একটি স্থায়ী ন্যাশন্যাল ফণ্ডেরও আবশ্যক। দেশের লোক অবশ্যই ক্রমশঃ একথা বুঝিবেন।

ঃ।

নানাকথা।

বঙ্গে ছাত্রজীবন আজ নিরতিশয় বিপদসঙ্কুল। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের মমতা নাই, বিচারকের ন্যায়পরতা নাই, স্বয়ং বঙ্গেশ্বর ধার্ম্মিকপ্রবর টমসন ছাত্রের নামে খড়্গহস্ত। কোথায় কোন্ বিদ্যালয়ের বালক হাঁচিল কি হাসিল, কাশিল কি করতালি দিল, বালস্বভাবসুলভ চাপল্যপ্রণোদিত হইয়া কোথায় কে 'টু' শব্দ করিল, ইহা অনুসন্ধান করাই ইদানীং বঙ্গশাসয়িতৃদিগের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গাধিপের হস্তে বস্তুতই কি আজকাল আর কোন গুরুতর কার্য্য নাই? তাই স্বরাজ্যমধ্যে ছাত্রবধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন? আর সেই যজ্ঞসম্পাদনার্থে প্রাদেশিক প্রাড়্বিবাকদিগকে হোতা নিযুক্ত করিতেছেন? যে ছাত্রজীবন অন্যত্র সুখশান্তির ও স্ফূর্ত্তির আধার, তাহা এই হতভাগ্য বঙ্গভূমে ঘৃণা, অপমান, নিন্দা, লাঞ্ছনা, কারাবাস ও জল্লাদের বেত্রাঘাতের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! আমাদের সুকুমারমতি বালকবৃন্দ তরুণবয়সে শিক্ষার অবস্থায়, বিদ্যামন্দিরের বক্ষঃস্থল হইতেই যখন কলঙ্কের কূপে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিল, তখন আর তাহাদের ভাবিজীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আশা কোথায়।

বালকে বৃদ্ধোচিত প্রাজ্ঞতা সম্ভবে না। বালকে বালস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। বালক চিরকালই বালক। বালকে যদি পরিণতবয়স্ক প্রাজ্ঞোচিত কার্য্যই করিবে তবে আর তাহার বালকত্ব কোথা? তবে আর তাহার শিক্ষারই বা আবশ্যকতা কি? রাজনীতির প্রগাঢ় আলোচনাপ্রসঙ্গে এই সকল সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ কথা আমাদের অধুনাতন ইংরাজ অভিভাবকগণ কি একবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন? না পুত্রকে বধিয়া পিতাকে শিক্ষা দিতেছেন? সে দিন কৃষ্ণনগরের রামমোহনের মহামতির কথায় যেরূপ প্রকাশ, তাহাতে পিতৃঋণের জন্য পিতার জীবনসত্ত্বেই অপোগণ্ড পুত্রকেই দায়ী করা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

বালককৃত দুষ্কৃত অবশ্য সর্ব্বথা দণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে দণ্ডের প্রকৃতিভেদ আছে। দুই জন বা দশ জন বালকের স্বভাবজাত চাঞ্চল্য নিবারণ বা শাসনার্থে সোয়ার সিপাহী-পোলিস-ম্যাজিষ্ট্রেরও কি আবশ্যক হয়? শিক্ষার্থে—চরিত্রসংগঠনার্থে বালক শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত; শিক্ষকই ছাত্রের বিচারক ও দণ্ডদাতা। ছাত্রজীবনে বালক শিক্ষকেরই অধীন; বিদ্যালয়ের বেঞ্চই তাহার প্রকৃত বিচারস্থল,—ফৌজদারী কোর্টের কাঠগড়া নহে। ছাত্রের দণ্ডবিধান শিক্ষকে করিলে যেমন স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়, এমত আর কিছুতেই হয় না। উহা যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি ছাত্রের চরিত্রসংগঠনকল্পে উপযোগী। কিন্তু সে কাল আর নাই। হাল আইনে সকলই বিপরীত। বাঙ্গালী যাহাতে শীঘ্র অধঃপাতে যায়, সকল দিক হইতে কেবল তাহারই যোগাড় হইতেছে।

অধুনাতন ছাত্রদিগের আচারব্যবহারে আমরা আদৌ সন্তুষ্ট নহি। ইঁহাদের তরিবৎ দিন দিন জঘন্য হইতেই চলিয়াছে। ইঁহাদের স্বভাব উদ্ধত, মেজাজ 'ত্রাংক্ষী'। ইঁহাদের ব্যবহারে বেয়াদবী, বাক্যে বাচালতা। সকল শিক্ষার অগ্রে ইঁহারা শিক্ষা করেন—ঠেঠামী করিতে, আর (কামারের কুমারবৃত্তি) রাজনৈতিক তর্ক ছাঁটিতে। বলা বাহুল্য যে, ছাত্রদিগের এই সকল কুরীতির আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। স্বাস্থ্যপ্রদ সুশাসনপ্রভাবে যাহাতে তাঁহারা সুশীল হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে মনোযোগী হন, তজ্জন্যই আমরা অধিকতর অভিলাষী। কিন্তু ছাত্রগণ যে আজকাল এত 'বেতামিজ' হইতেছেন, ইহার কারণ কি? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়,ইহার একমাত্র কারণ—শিক্ষকদিগের শিক্ষকোচিত গুণের অভাব। আজকালকার শিক্ষকগণ সাধারণতঃ উদ্ধতচিত্ত,—এক মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের উষ্ণশোণিত উছলিয়া উঠে। শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকদিগের ত কথাই নাই। তাঁহারা প্রায়শই জীঙ্গোদেবের জীবন্ত অবতার,—নিগার ছাত্রদিগকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন। সদুপদেশ দেওয়া বা সুশাসন করা দূরের কথা,—অষ্টপ্রহর ছাত্রদিগের সম্মুখে যে অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ধরিয়া দিতেছেন, তাহাতে তাহাদের সরল চিত্ত কেবল বক্রভাবই ধারণ করিতেছে। শিক্ষাপ্রণালীর যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে ছাত্রকে 'পাস'করানই শিক্ষকদিগের একমাত্র কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছাত্র 'বি, এ' পাস করিয়া বানর কি বয়েল হইয়া বাহির হইবে, তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। লক্ষ্য থাকিয়াই বা কি হইবে? যাহাদের নিজের স্বভাব শতছিদ্র তাহারা অন্যের স্বভাব সংশোধন ও সংগঠন করিবে কিরূপে? শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে বালককে প্রেরণ করা আজকাল অশেষ অনিষ্টোৎপাতের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের মমতা নাই, ছাত্রও শিক্ষককে গ্রাহ্য করে না। ফল যাহা হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন।

শিক্ষকের উদ্ধতভা, অভদ্রোচিত ব্যবহার ও উলঙ্গ প্রকৃতি দেখিয়া ছাত্র হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিল না। কৌতুক করিল, করতালী দিল। শিক্ষক শ্বেতাঙ্গ, সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রকার দণ্ডের অতীত। ছাত্রদিগকে দণ্ড দেওয়া হইল,—কি, না তাহারা সম্বৎসরকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেই যেন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে,—চাপল্য ধ্বংস হইবে। ইহা কি প্রকারের দণ্ডবিধি, তাহা অবশ্য আমরা বুঝিতে পারি না, তবে প্রেসিডেন্সী-কালেজের কতকগুলি ছাত্র বৎসরাবধি যে বিদ্যালাভে বঞ্চিত থাকিবে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিতও নহি। আজকালকার বিদ্যালয়ের যে রূপ বিদ্যা,—সে বিদ্যালাভে বঞ্চিত থাকাই শ্রেয়ঃ। গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে বালক না পাঠানই এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন সহযোগী সংবাদপত্র ছাত্রদিগকে যেরূপ 'আস্কারা' দিতেছেন তাহা নিতান্ত দূষনীয়। ছাত্রদিগের বস্তুতই উভয় দিকে বিপদ।

মাননীয় ইলসন বাহাদুরের অভূতপূর্ব্ব ছাত্র-শাসন-মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে রাজপুরুষগণ স্বভাবতই নাচিয়া উঠিয়াছেন। 'যেনতেনপ্রকারেণ' ক্ষীণপ্রাণ অল্পবুদ্ধি ছাত্রদিগের শান্তিবিধান করিয়া স্ব স্ব প্রভু-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এমন দিনই যাইতেছে না, যে দিন ছাত্রসংক্রান্ত কোন না কোন একটা কাণ্ড আমাদের কর্ণগোচর না হইতেছে। সে দিনকার কৃষ্ণনগরের ব্যাপার কৌতুকাবহ নয় কি? যাত্রা শুনিতে যাইয়া কয়েকজন অশিষ্ট বালক করতালি দিল,—ঘটনা ত এই কিন্তু এই। ঘটনায় স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রসাতল তলাতল সমস্ত একাকার! জিলার মাজিষ্ট্রেট পুলিসের বড় মেজের স্ব স্ব মস্তিষ্কগর্ভে পরিবৃত হইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়নপূর্ব্বক পরস্পরে মন্ত্রনা আঁটিতে লাগিলেন। মেজর মাজিষ্ট্রেটের "Han din glove" হইয়া গেলেন। ওদিকে স্বয়ং ছোটলাট আগ্রহ ও ব্যস্ততার সহিত তারের

উপর ভার পাঠাইতে লাগিলেন। দেশ-ময় মহা হুলস্থূলপড়িয়া গেল, রাজনৈতিক-চক্র ক্ষিপ্রবেগে ঘুরিতে লাগিল। সেন কম আসিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু ঘটনাটা কি না, কয়েকটা স্কুলের ছোকরা যাত্রার আসরে 'দুষ্টুমী' করিয়াছে। বলি পিয় মহাশয়। বুদ্ধের বলিকত্ব আর কাহাকে বলে? ক্ষিপ্তা কি আর সত্য-সত্যই বুদ্ধের ফল। বর্ত্তমান কাহিনীতে যে সব রহস্য প্রকাশ, তাহা দর্শীস সম্বাদ-পত্র কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইতেছে অতএব আমরা আর অধিক কথা বলিব না।

'বিজ্ঞান দর্পণ' বিজ্ঞান-বিষয়ক মাসিক-পত্র। আজ তিন বৎসর হইতে এই পত্র খানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী কার্য্যকরী বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণতঃ বীতশ্রদ্ধ। বাঙ্গালী বরং দুই-দণ্ড দুর্বোধ্য দর্শনশাস্ত্রের 'ঢেঁকির কচকচি' লইয়া কৌতুক করিবেন,—তথাচ কিরূপে দিয়াশলাই বা সাবান প্রস্তুত হয়—কিরূপে বিদ্যুৎসহযোগে তারের ভিতর দিয়া খবর আসে, এ সকল কথার আলোচনা করিতে উৎসুক নহেন। সেইজন্য গত দুই বৎসর মধ্যে বিজ্ঞান-দর্পণ বাঙ্গালীর মজলিসে কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। তবে 'বিজ্ঞান-দর্পণ' আজকাল যে রূপ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে আর উহা কাহারও নিকট অনাদৃত হইবার কারণ দেখি না,—কেননা উহা আর এক্ষণে কেবলমাত্র বিজ্ঞান নহে, উহাতে অন্যান্য আরও অনেক দ্রব্য সংরাজিত হইয়াছে। বাঙ্গালীকে বিজ্ঞান গিলাই-বার জন্য সুমিষ্ট অনুপানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছয় ফর্ম্মা বিজ্ঞান দর্পণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, দুইফর্ম্মা বিজ্ঞান, দুই ফর্ম্মা কাব্য-কৌতুক-রহস্য-উপন্যাস ও দুইফর্ম্মা ধর্ম্মতত্ত্ব দেওয়া হইতেছে। প্রথম 'বিজ্ঞান দর্পণ' দ্বিতীয় সহচরী, তৃতীয়, জাহ্নবী। এ তিনই একত্রে ও পৃথক্ পৃথক্ পাওয়া যায়;—তিনেরই লেখা ভাল ও তিনেরই সম্পাদনকার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় গ্রহণ করিয়া-ছেন। বীরেশ্বরবাবুর তত্ত্বাবধানে এই তিনখানি কাগজই যে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে, এমত আশা করা যায়। বিজ্ঞান দর্পণের সার-সংগ্রহ 'পাক্ষিক সমালোচকে' কয়েকবার প্রকাশিত হইয়াছিল,—এক্ষণ হইতে আমা-দের 'সহযোগী-সাহিত্য'স্তবকে আরও নিয়-মিতরূপে উহার 'সারসংগ্রহ' ও 'সমালো-চনা' দেওয়া যাইবে। কিন্তু এস্থলে একটা কথা। বঙ্গরস, কাব্য উপন্যাস, ফোষ্টী-নষ্টা বা ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক কাগজ আমাদের অনেক হইয়াছে ও হইতেছে। দেশে বাকা-বৃহস্পতির অভাব নাই, কাযেই বাচালতা পূর্ণ আলস্যসুহৃৎ সংবাদ ও সাময়িক পত্রেরই শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু এত বড় দেশ-টায়—যে দেশে সম্প্রতি 'নবযুগ' উপ-স্থিত,—আর যে দেশের লোক সাময়িক সাহিত্য বেচিতে ও কিনিতে এত তৎপর,—সেদেশে অসংখ্য কাগজের মধ্যে, একখানি ছয় ফর্ম্মা বিজ্ঞানপত্র টিকিল না, ইহা বস্তুতই বড় লজ্জার কথা। ভাই বাঙ্গালি। ধিক্ আমাদিগকে, আর ধিক্ আমাদের বাক্যাড়ম্বরপ্রিয়তাকে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি-তেছি যে, সাময়িক ও সংবাদপত্রগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক সম্প্রতি সমালোচনার জন্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা,—(১) স্ত্রীদিগের প্রতি উপ-দেশ, (২) কয়েকখানি পত্র ও তাহার উত্তর (৩) মুক্তি ও তাহার সাধনসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ, (৪) তরণীসেন বধ নাটক, (৫) রাজা বিক্রমাদিত্য নাটক, (৬) কাব্য-সুন্দরী, (৭) সমাজচিন্তা, (৮) মানব-তত্ত্ব; (৯) জয়াবতী—দৃশ্যকাব্য, (১০) পাতঞ্জল-দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট, (১১) রমল প্রকরণ; ইত্যাদি। উক্ত কয়খানি পুস্তকই সুখপাঠ্য ও সারগর্ভ। বিশেষতঃ 'মুক্তি ও তাহার সাধন', 'সমাজচিন্তা,' 'মানবতত্ত্ব', ও 'পাত-ঞ্জল দর্শন' গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। পুস্তকগুলির বিস্তৃত সমালোচনা 'পাক্ষিকে' ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন১২৯১ সাল; আশ্বিন, প্রথম পক্ষ।[পঞ্চদশ সংখ্যা।

৩ জগৎরাম রায়ের রামায়ণ

ভরত সংবাদ।

আরে ভাই শত্রুঘ্ন, হেথা আসি বসি শুন,
স্বপ্ন কত বিঘ্ননশী দেখি।
কেশবাস দঢ় বন্ধ, ইথে স্বপ্ন দেখি মন্দ,
তাথে হইতে ঝুরে দুটি আঁখি॥
এমন স্বপন ভাই, আমি কভু দেখি নাই,
একি আমি দেখি নিশি শেষে।
শুন ভাই মন দিয়া, বলিতে বিদরে হিয়া,
সর্ব্বনাশ হৈল বুঝি দেশে॥
সত্যবন্ধি ছিল পিতা, বরমাগি নিল মাতা,
রামে রাজা করিতে না দিলা,
শ্রীরাম বাকল পরি, চিরুবেতে জটা ধরি,
রামধন বনে প্রবেশিলা।
লক্ষ্মণ জানকী সনে, বনে গেলা তিন জনে,
হেনকালে প্রভু মোরে কন,
শুন রে ভরত ভাই, মায়ে তোরে সঁপি যাই,
জননীর করিহ পালন।
রামচন্দ্র এই বলে, মোরে তুলি নিলা কোলে,
প্রেমধারা প্রভুর নয়নে।
মোরে করি শুভাশীষ, বনে গেলা জগদীশ,
আমি তখন পড়ি অচেতনে।
তার শোকে সব লোকে, ভূমে পড়ি লড়ি* থাকে
হাহাকার করে প্রজাগণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা, বনে পাঠাইয়া পিতা,
শোকাকুলে ত্যজেছে জীবন।
অযোধ্যা আঁধার দেখি, কাঁদে সব পশু পাখী,
পুরী ভাসে লোচনের জলে।
দেউলের ধ্বজা ছাড়ে, বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে,
প্রভু লাগি কাঁদিছে সকলে।
আমারে কৈকৈ মাকে, ছিছি ধিক্ বলে লোকে
হেন স্বপ্ন না দেখি কখন।
আমারে দেখিয়া প্রজা, আসে গ্রাম ধাম ত্যজে
মোরে কেহ না কহে বচন।
শুন শত্রুঘ্ন ভাই, স্বপ্ন দেখি প্রাণ নাই,
কলেবর কম্পিত হইল,
জিহ্বাতে লাগিল দন্ত, মন মোর হয় ভ্রান্ত,
এ বৃত্তান্ত বুঝিতে নারিল।
কোন কথা নাহি রুচে, কেন বামচক্ষু নাচে,
স্বপ্নে রাম আজি গেল বন।

*লড়ি ব্যাকুল হইয়া গড়াইয়া বেড়ায়। বাঁকুড়া অঞ্চলে সদা প্রচলিত শব্দ।

আমার ললাটে পাছে, এমতি লিখন আছে,
তবে বাঁচি নাহি প্রয়োজন।
রামের এ দশা যবে, আমি কি বাচিব তবে,
এইক্ষণে প্রাণ তেয়াগিব।
রাম লাগি হব যোগী,গৃহে গৃহে ভিক্ষা মাগি,
অথবা কি গরল,ভখিব।
শত্রুঘ্ন কন দাদা, তুমি,হে ধার্ম্মিক সদা,
প্রভুপদে নিষ্ঠা তব মতি।
স্বপ্ন কভু সত্য নয়, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়,
না ভাবিহ এতেক দুর্গতি।
এইমতে দুই জন, উন্মনা হইয়া বন,
হেনকালে গেল সে ধাবক।
দ্বিজ জগদাম্ম গায়, রাখ রাম রাঙ্গা পায়,
দায় তার নাশিহ পাতক।

এই মনে দুই জন একাসনে বসি
অযোধ্যার পথ পানে চান অনিমিষী।
হেনকালে ধাবক ধাইয়া তথা গেলা,
দূরে হইতে দুঁহে তারে দেখিবারে পাইলা।
ওরে ভাই ঐ আসে অযোধ্যার লোক,
দ্রুতগতি দেখি অতি কিন্তু ম্লানমুখ।
কি জানি কি এসে বলে কি কপালে আছে,
এ ভাবিতে দূত প্রণমে ভরত কাছে।
মুখে খড়ি উড়ে তার বাক্য না বেরোয়,
কোন কথা না বলিয়া বলে হায় হায়।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে নয়ন সজল,
কি করি কহিবে দূত এত অমঙ্গল।
ভরত বলেন ভাই শুন শত্রুঘন,
নিতান্ত জানিনু মোর ফলিল স্বপন।
ধেয়ে আসি ধাবক না কয় কোন কথা,
বুঝি চিত্তে বড়ই বিপত্তি বটে তথা।
আরে আরে চরবর না কর উত্তর?
কেমন আছেন মোর পিতৃ নৃপবর?
রাম ঘনশ্যাম মোর আছেন কুশল?
প্রাণধন লক্ষ্মণের বল সুমঙ্গল।
মন্ত্রিবর্গ সব প্রজা আছে আনন্দিত?
বন্ধু বান্ধবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসি বিহিত।
কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে,
তাহা দেখি ভরত বিকল হইল শোকে।
কতক্ষণ গতে পুনঃ কহে সেই চর,
মোরে নিষ্ঠা পাঠালে বশিষ্ঠ মুনিবর।
ত্বরা করি চল ঘর শুন মোর বাণী,
অন্য কথা বলিতে নিষেধ কৈল মুনি।
আর যদি কোন জিজ্ঞাসিবে বিবরণ,
গুরুর বচন তবে হইবে লঙ্ঘন।
ইহা শুনি হিয়া ফাটে দু ভাই বিকল,
সলিলের ধারা বহে নয়নযুগল।
কি হইল বলি গেলা মাতুলের স্থানে,
ওহে ১) মামা বিধি বাম হইল এতদিনে।
ধাওয়াধাই যাই দেখি কি বটে কারণ,
মোর দিব্য লাগে যদি করহ বারণ।
এতবলি মাতুলানী পদে প্রণমিল,
ঊর্দ্ধমুখে মনদুখে ধাইতে লাগিল।
স্নান জলপান দুহে না করিল পথে,
কি হলো কি হলো বলি ধায় বেগ দ্রুতে।
পথে যেতে ভরত ভাবেন মনে মনে,
দূত কোন বিবরণ না কহিল কেনে।
অতএব ভাবি দৈব হৈল মোর গৃহে,
জনক যে বৃদ্ধ মোর গৃহে শীর্ণদেহে।
বিধির ঘটনে বুঝি তাঁর কিছু হলো,
তবে চারি ভাই বড় বিপদে পড়িল।
এ লোক সাগর পার হইবার তরে,
রাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৌকা আছে মো সবারে।

---

(১) ওহে মামা। আমাদের কাণে কেমন কেমন শুনায় বটে, কিন্তু বাঁকুড়া অঞ্চলে এখনও গুরুজনকে 'হে' সম্বোধন প্রচলিত আছে।

পিতার কোলেতে যেন করিতাম খেলা,
শ্রীরামের কোলে বসি নাশিব এ জ্বালা।
পরম দয়াল হন রাজীবলোচন,
কনিষ্ঠের কষ্ট না দেখিবে কদাচন।
শিলা, তরী, বিপ্র, নারী করিলা উদ্ধার,(১)
হেন দাদা থাকিতে কি দুঃখ পাব আর?
পিতা কিছু হ'লে দাঁড়াবার স্থান আছে,
শ্রীরামের পীড়া হলে যাব কার কাছে?
দাদার হইলে দুখ মুখ না দেখাব,
তার কষ্ট ভাগী হয়ে আমরা মরিব।
এই নানা অনুমানি মানসে ভরত,
অশ্রুজলে ভিজে বলে নাহি দেখি পথ।
দূর হইতে পথে যেতে অযোধ্যা দেখিলা,
স্তব্ধমান পুরীখান শব্দ না পাইলা।
দূর হইতে অযোধ্যার যতেক বালক,
ভরত ও শত্রুঘ্ন দেখিয়া দুঃখ লোক।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জ্ঞান করিয়া দুজাকে,
আনন্দে সকল শিশু ফিরে বেড়াপাকে।
জগতরাম ভণে মনে মনে অতি আশ,
কতদিনে এ দীনে করিবে নিজ দাস।

---

(১) শিলা, তরী, বিপ্র, নারী ইত্যাদি

(ক) গৌতমমুনির পত্নী অহল্যা ইন্দ্রের দুরাচার হেতু গৌতমের শাপে বনে পাষাণী হইয়া থাকে, পরে রামপদস্পর্শে শাপমুক্ত হয়।

(খ) রামচন্দ্র জনকালয় গমনকালে গঙ্গা পার হইবার সময় এক কৈবর্ত্তের প্রতি কৃপা করিয়া তাহার নৌকা সোণার নৌকা করিয়া দেন।

(গ) বিপ্র, নারী, পৃথক্ দুই শব্দ, একপদ নহে,। বিপ্র ঋষিগণ তাঁহাদের যজ্ঞ রক্ষা তাঁহাদের উদ্ধার। নারী, সীতার ধনুর্ভঙ্গপণ হইতে উদ্ধার।

ফিরে ঘরে রাম এলো রে।
যত অযোধ্যার বালক, মারিছে মালক (১)
পুলক হইল রে।
ফিরে ঘরে রাম এলো রে।
ভরত সবার আগে, শত্রুঘ্ন পাছু ভাগে,
রাম ফিরে এলো, সবে বল বল,
এই বলি ধায় বেগে।
ভরত রামের প্রায়, শ্যামল সুন্দর কায়।
লক্ষ্মণ সমান, কাঞ্চনবরণ,
শত্রুঘ্নে দেখি ধায়।
যূথ যূথ শিশু মিলি, ধাইছে দু ভুজ তুলি,
কেহ বলে আগে, কহি গিয়া বেগে,
কৌশল্যা মা আছে ভোলিয়ে।
কালি শোকে পিতা মৈল, সে শুনিয়ে ফিরি আইল
ভাল হইল ভাল হইল রে।
রাম ঘরে ফিরে এলো,
মনের আধার গেল,
করুণা করিয়ে বিধি, ফিরালে গুণের নিধি,
আসিয়া সদন, মদনমোহন
পুন নাহি যায় যদি।
কেহ বলে মৈল পিতা,
সে ছিল এ দুঃখ দাতা।
মৈল তেকারণ, পাঠাইয়া বন,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা।
আর শিশু কহে কথা,
আছয়ে ভরতমাতা,
কৈকৈ বাটীতে, কে রাখে গৃহেতে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা।
এই নানা মনে করে,
চিনিতে না পায় দূরে,

(১) মালক উর্দ্ধে লম্ফপ্রদান, দিগ্বাজি। এটি সদা প্রচলিত শব্দ। বোধ হয় মালসাট শব্দের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

জলবিন্দু আশে, পীযুষ পিয়াসে,
চাতক যেমত করে।
কোন শিশু বলে দেখি,
দু ভাই বটে ধনুর্কী,
কচি নীলশ্যাম, নয় যেন রাম,
সঙ্গে না দেখি জানকী।
সবে চল চল ধেয়ে,
নিকটে দেখিব গিয়ে।
হয় কিবা নয়, জানিয়া নিশ্চয়,
আসিব তবে ফিরিয়ে।
এই বলি সবে ছুটে,
গেল ভরত নিকটে।
ভরতে দেখিয়ে, মনে ভয় পেয়ে,
ধেয়ে ফিরে আসে বটে।
মিছা কবি কাছে আইল,
সে নিধি বিধি হরিল।
যার হইতে দুখ, না দেখি তার মুখ,
বুক বিদারিয়া গেল।
এ দেশে আর না রব,
অন্য কোন দেশে যাব।
এই সবে কহে, নেত্রে জল বহে,
শিশু কাঁদি ফিরে সব।
একথা ভরত শুনি,
চকিত হলো অমনি,
দ্বিজ জগতরাম, কাব্য অনুপম,
রচয়ে অমৃত সানি। (১)

গ্রামপ্রান্তে নিতান্ত এ ভরত শুনিলা,
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে ধিক্কার মানিলা।
তারপর দুই ভাই কতদূরে যান,
না দেখিতে পান সেই পূর্ব্বের উদ্যান।
মহা ঝড়ে বৃক্ষ যেন পড়ে ডাল মূলে;
হেন মতে কত শত পড়েছে ভূতলে।
পাল পাল ধেনু অচেতনে আছে পড়ে।
বৎস যত মূর্চ্ছাগত দুগ্ধপান ছেড়ে।
গোধনের নয়নেতে ধারা বহে যায়।
অন্য পশু পাখী আঁখি মুদিয়া লোটায়। (২)
হেন সব অসম্ভব উপদ্রব দেখি।
ভরত বলেন শত্রুঘ্ন একি! একি!
তারপর নগরে প্রবেশি দুই জন।
জনপথে লক্ষ জন চলে প্রতিক্ষণ,
হেন রাজপথে প্রাণীমাত্র নাহি চলে।
কলধ্বনি নাহি শুনি অযোধ্যামণ্ডলে।
জয়ঘোষ দিবা নিশ বাজে সেই পুরে,
নানা বাদ্য ভাণ্ড মোহে সব ঘরে ঘরে,
যথা সদাকালে হত কলকল শব্দ,
এ হেন অযোধ্যা শূন্যময় অতি স্তব্ধ।
কেহ ঘরে কেহ দ্বারে পথে পড়ে আছে।
বদনে বচন নাহি নেত্রস্থু বহিছে।
হরিগুণ গানে যে যে জন ছিল রত,
খোল করতাল ধরি লোটায় তেমত।
যাহার যেমন কর্ম্ম যাতে ছিল যুক্ত।
তেমতি বিধানে আছে জ্ঞানমাত্র ত্যক্ত।
প্রভু রাম নিজধাম ত্যজিল যখন,
সে বৃত্তান্ত শুনিল যেখানে যেই জন,
সেই স্থানে অচেতনে সেই পড়ি আছে,
কেহ কারে খবর দিবার নাহি আছে।
হেন মত ভরত দেখেন মধ্য পুরে।
শোকসিন্ধুমাঝে ভাসি হাহাকার করে।
বিবরণ কত জনে করেন জিজ্ঞাসা,
কে উত্তর দেয় তার সকলই অদিশা। (৩)
ছারখার দেখি পুরি হাহাকার বলে,
দেখ প্রাণ শত্রুঘ্ন কি আছে কপালে।

(১) সানি মাখিয়া।

(২) সমস্ত কাব্যের মধ্যে এইটুকুমাত্র অতিশয়োক্তি আছে। কীর্ত্তিবাসের সহিত তুলনায় বোধ হয় এইটুকু ক্ষমার্হ।

(৩) অদিশা অজ্ঞান; যথা দিশাহারা।

মোহ ভ্রান্ত হবে দোঁহে হইলা ক্ষিপ্ত ন্যায়।
কারণ না জানি কাঁদে করে হায়! হায়!
চল ঘর ভ্রাতা মোর পিতার নিকট,
জিজ্ঞাসিব তারে, কেন এ হেন শঙ্কট।
অযোধ্যার মধ্যে দিব্য বাজার মত,
তথা উপস্থিত দ্রুত দু ভাই চঞ্চল।
রাজলক্ষ্মী বিবর্জ্জিত ভবন দেখিলা,
হস্তিশালে বিকল গজেন্দ্র আছে টল্যা। (১)
ঘোড়াশালে গড়াগড়ি দেয় সব ঘোড়া।
দ্বারপালগণ কিবা জ্ঞান যেন হারা।
তারপর গেল যথা বৈসে মন্ত্রিগণ।
শূন্য সভা দেখে যথা রাজসিংহাসন।
চকিতে চাহেন চক্ষে বহে জলধারা।
ওহে শত্রুঘ্ন পাছে পিতা হৈনু হারা?
অথবা আছেন পিতা মাতার নিকটে।
শুধাই নিতান্ত চল কি বৃত্তান্ত বটে।
ধাওয়াধাই গেল দুই ভাই মাতৃ স্থানে,
কৈকৈ বসিয়া একা আছে সিংহাসনে।
দ্বিজ জগৎরাম ভণে ভাবি ভগবান,
ভরতের ব্যানোহে বিদীর্ণ হয় প্রাণ।

(১) টল্যা টলিয়া পড়িয়া।

মনুষ্যতত্ত্ব।

হিন্দুশাস্ত্রের বিষয় অবগত হইতে হইলে যে ভাবে ঐ শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব বুঝিতে হয় প্রথমে তাহা জানা আবশ্যক। যাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চ্চা করেন তাঁহারা অগ্রে শাখা প্রশাখা অনুসন্ধান করিয়া পরে মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা মূল হইতে ক্রমে শাখা প্রশাখায় গমন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "আমরা মূল দেখিতে পাই না, অতএব শাখা ধরিয়া না গেলে মূল কি রূপে পাইব?" হিন্দু ঋষিগণ বলেন "শাখা অসংখ্য, শাখা ধরিয়া মূলে আসিতে হইলে সমগ্র বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন। অতএব মূলের তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। মূলের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে সমস্ত শাখার কি ভাব তাহা সম্যক জানিতে না পারি তাহাদিগের সাধারণ ভাব যে অবগত হইতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।" পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার উত্তরে বলেন, "তোমরা যাহাকে মূল বলিতেছ উহা বাস্তবিক মূল কি না তাহা কে বলিতে পারে?" ঋষিগণ তদুত্তরে বলেন "আমরা মূল আবিষ্কার করিবার যন্ত্র দিতেছি, তোমরা ঐ যন্ত্র লইয়া মূল খনন করিয়া লও। তোমরা ফল হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে পত্র, পত্র হইতে শাখা, এই রূপে অবরোহণ প্রণালীতে অনেক অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পর মূলে পৌঁছিতে পারিবে সত্য, কিন্তু

যখন আমরা মূল দেখাইয়া দিতেছি তখন এত পরিশ্রমের আবশ্যকতা কি? আমরা তোমাদিগকে যে যন্ত্র দিতেছি সেই যন্ত্র-সাহায্যে একেবারে মূলে যাইতে পারিবে। ঐ মূল যথার্থ কি না এবং উহার সহিত তোমাদের দৃশ্য শাখাপ্রশাখার সংস্রব আছে কি না তাহাও তোমরা বুঝিতে পারিবে।"

পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত না করিয়া বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমাদের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা উহার ঠিক বিপরীত পথ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা প্রথমতঃ একটী সূত্র নির্দ্দেশ করেন। ঐ সূত্রটী যে সত্য তাহা অগ্রেই বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে অন্ধের ন্যায় সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে বলেন না। তাঁহারা যে সূত্র নির্দ্দেশ করেন, কি করিলে তাহার যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও বলিয়া দেন। সুতরাং অনতি-বিলম্বেই শিষ্য নিজেই সমস্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঋষিরা কাহাকে মূল বলিতেন এবং ঐ মূল খনন করিয়া লইবার যন্ত্র কি? পাক্ষিক সমালোচকের স্তম্ভে অথবা রাজকীয় ডাক-যোগে পাঠকবর্গকে উহা উপহার দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব ঐ যন্ত্রের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া অথবা মূল কি প্রকার সামগ্রী তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস না পাইয়া, মূল কোথায় আছে কেবল ইহাই আমরা পাঠকগণকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

সকল তত্ত্বের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমে মনুষ্যতত্ত্ব বুঝিতে হয়। মনুষ্যতত্ত্ব সমস্ত বুঝিতে পারিলে অপরাপর তত্ত্বের মূল বুঝিবার জন্য আর অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। ঋষিরা মনুষ্যকে একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশ্ব সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা মনুষ্যের নাই। যে নিয়মে মনুষ্য চালিত হইতেছে সমস্ত জগৎও ঐ নিয়মে চলিয়া থাকে। মনুষ্য তত্ত্ব না জানিলে বিশ্বতত্ত্ব জানা যায় না এবং বিশ্বতত্ত্ব না জানিলে মনুষ্যতত্ত্বও জানা যায় না। উভয়ের পরস্পর এমনই সম্বন্ধ। কিন্তু যাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁহারা যদি মনুষ্যতত্ত্ব বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে জগতের সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া পড়িবে।

অনেকেই অবগত আছেন যে হিন্দু-শাস্ত্র এক নহে। শাস্ত্র বহু এবং মতও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমরা কোন্ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কোন্ মতের আশ্রয় লইয়া উপস্থিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব? অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়দর্শন, আগম, নিগম প্রভৃতিকে একত্রিত করা দূরে থাকুক ঐ সকল গ্রন্থ এক ব্যক্তির অধ্যয়ন করাই সহজ ও সম্ভব নহে। পরন্তু ঐ সকল গ্রন্থ অধীত হইলেও যাহারা অধ্যয়ন করিয়া তৎ তৎ প্রণেতাগণের অভিপ্রায়ের বিচার করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। সকল শাস্ত্রেরই এক এক প্রকার মত কিন্তু তৎ প্রণেতারা সকলেই মহামান্য হিন্দু ঋষি—কেহ কেহ দেবতা বলিয়া বিখ্যাত। শাস্ত্র সকলের মত পৃথক্ পৃথক্ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহা-